জেমস
বণ্ড
ইয়ান ফ্লেমিং
007
007
007
007

জেমস বণ্ড

ইয়ান ফ্লেমিং : একান্ত গোপনীয়

একান্ত গোপনীয়

(FOR YOUR EYES ONLY)

মূল রচনা ঃ

ইয়ান ফ্লেমিং

বঙ্গানুবাদ ঃ

অদ্রীশ বর্ধন

ব্লু-বেল পাবলিশার্স

১২৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড

কলিকাতা ২৬

মা'কে দিলাম

১

পাতালপুরীর মায়াবী

চওড়া কালো রবার গগল্‌স্‌-এর পেছনে শীতল চকমকির মতই ঝিকমিক করছিল চোখজোড়া। ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে উড়ে চলেছে বি. এস. এ. এম-টোয়েন্টি মোটর সাইকেল, ধেয়ে চলেছে কক্ষচ্যুত উল্কার মত। প্রচণ্ডবেগে ঝনঝন করে কাঁপছে যন্ত্রযানের ধাতব দেহ, থরথর করে কাঁপছে আরোহীর দেহ, উত্তাল হয়ে উঠছে রক্ত, কিন্তু কাঁপন নেই, চঞ্চলতা নেই, উত্তেজনা নেই শুধু ঐ দুটি প্রত্যঙ্গে—দুটি হিমশীতল চোখে—যা পাথরের মত কঠিন আর চক্‌মকির মতই অগ্নিগর্ভ।

গগল্‌স্‌-আচ্ছাদিত স্থির দুই চোখের দৃষ্টি হ্যাণ্ডলবারের ওপর দিয়ে সামনে বিস্তৃত—অচঞ্চল করাল সে চাহনির সঙ্গে তুলনা চলে কেবল রাইফেলের নলচের—কিংবা যেন একজোড়া আতস কাঁচ, যার ফোকাস সুদূরে নিবদ্ধ।

গগল্‌স্‌-এর নীচে উন্মুক্ত অধরোষ্ঠের ফাঁক দিয়ে হাওয়া ঢুকছে মুখগহ্বরে—প্রকট হয়ে উঠেছে সারি সারি দাঁত—ঠিক যেন দাঁত খিঁচিয়ে হাসছে চালক। এমন কি ঢিবি ঢিবি দাঁতের ওপরে দু-সারি সাদাটে মাড়িও দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। হাওয়ার ঝাপটায় ফুলে উঠেছে দু-গাল। থর থর করে কাঁপছে ছোটার বেগে। লৌহ-শিরস্ত্রাণের নিচেই ভয়াল মুখের দু-পাশ দিয়ে নেমে এসেছে দীর্ঘ কব্জিবন্ধ আর চামড়ার দস্তানা আচ্ছাদিত একজোড়া হাত—যেন সুবিশাল কোন পশুর আক্রমণোদ্যত কালো থাবা।

লোকটার পরণে রয়াল কর্স অভ সিগন্যাল্‌স্‌-এর ডিসপ্যাচ রাইডারের ইউনিফর্ম। অলিভ-গ্রাণ রঙ করা মোটর সাইকেল। ভাল্‌ভ্‌ আর কারবুরেটের বিশেষ কয়েকটা উন্নতিসাধন আর সাই-লেন্সারের কিছুটা অংশ সরানোর ফলে গতিবেগ যেন মুঠোয় এসে গেছে। ঠিক এমনি মেশিনই দেখা যায় বৃটিশ আর্মিতে। পোষাক আর যন্ত্রযান দেখে লোকটার সম্বন্ধে যে ধারণাই মনে আসুক না কেন, তা ভেঙে যায় পেট্রলট্যাঙ্কের ওপর ক্লিপ দিয়ে আঁটা একটা গুলিভরা 'ল্যাগার' রিভলবার দেখে।

মে মাস। সকাল সাতটা। সিধে রাস্তা। দুপাশে জঙ্গল। বসন্তের সকাল। তাই ছোট ছোট আলোকময় কুয়াশা ভাসছে এখানে-সেখানে। পথের দুপাশেই শ্যাওলা আর ফুলের কার্পেটে মোড়া বনতল। দানবাকৃতি ওকগাছের সারি। ভার্সাই আর সেণ্ট জার্মেন-এর মায়াবী রয়াল ফরেস্ট। বুক ফুঁড়ে এলিয়ে থাকা সিধে রাস্তাটার নাম ডি ৯৮। এই অঞ্চলের গাড়ীঘোড়া যাতায়াত করে এ রাস্তায়। এইমাত্র প্যারিস-মন্তেজ-এর মোটর-রাস্তা পেরিয়ে এল মোটর-সাইক্লিস্ট। সে-রাস্তায় মোটর গর্জনের আওয়াজে কান পাতা দায়। সব গাড়ীই চলেছে প্যারিসের দিকে। কিন্তু মোটর-সাইক্লিস্ট চলেছে উত্তরে সেণ্ট জার্মেন-এর দিকে। এদিকে দিগন্তবিস্তৃত সড়ক, স্নিগ্ধ সবুজ অরণ্য আর আধমাইলটাক সামনে দ্রুত সঞ্চরমান একটি বিন্দু ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না।

ছুটে চলেছে আর একজন রয়াল কর্স ডিসপ্যাড রাইডার। এর বয়স কম। চেহারা অনেক ছিপছিপে। মনের আনন্দে বাইক চালাচ্ছে তরুণটি। মিষ্টি সকালের আমেজ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে যেন। গতিবেগ রেখেছে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইলের মত। মনে মনে ভাবছে আটটা নাগাদ হেড কোয়ার্টার্সে ফিরে ডিমগুলো খাওয়া যায় কিভাবে। ভাজা করে, না, ঘেঁটে নিয়ে?

পাঁচশো গজ, চারশো, তিন, দুই, এক। পেছনকার মোটর-বাইক চালক খসে পড়া তারার মতই প্রচণ্ডবেগে আসতে আসতে সহসা কমিয়ে আনল গতিবেগ…ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল। দাঁতের ফাঁকে টিপে খুলে ফেলল ডানহাতের দস্তানা এবং খোলা দস্তানাটা গুঁজে রাখল সার্টের বোতামের ফাঁকে। তারপর, হাত নামিয়ে ক্লিপ খুলে তুলে নিল রিভলবারটা।

এবার নিশ্চয় সামনের মোটর সাইকেলের ড্রাইভিং আয়নায় ফুটে উঠেছিল পেছনকার মোটর সাইকেলের প্রতিবিম্ব। এই সকালে আরেকজন ডিসপ্যাচ রাইডার দেখে তরুণ চালকও নিশ্চয় অবাক হয়েছিল। তাই, হঠাৎ চট করে মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিল পেছনে। এ সময়ে একই পথে দু-দুজন ডিসপ্যাচ রাইডার আসাটা একটু বিচিত্র সন্দেহ নেই। মনে মনে ভাবল, হয়তো আমেরিকান বা ফ্রেঞ্চ মিলিটারী পুলিশ। আটজাতির 'ন্যাটো' সংঘ থেকেও হয়তো কেউ আসতে পারে এ সময়ে, কিন্তু কর্সের ইউনিফর্ম চেনবার পর যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষ দেখা দিল তরুণের মনে। লোকটা কে, তা তো দেখা দরকার। ডানহাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে ইসারায় জানায়, কর্সের চিহ্ন তার চোখে পড়েছে। নিজেও গতিবেগ কমিয়ে আনে তিরিশের ঘরে। পেছনকার চালক যদিও বয়োজ্যেষ্ঠ, তাহলেও পাশাপাশি হলে গল্প করা যাবে'খন। এক চোখ সামনে পথের ওপর রেখে আরেক চোখ দিয়ে কোনাকুনি ভাবে দেখে দর্পণের বুকে দ্রুত আগুয়ান দ্বিতীয় ডিসপ্যাচ রাইডারকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শুধু একটা ছায়ামূর্তি ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে আয়নায়। লোকটা কে? মনে মনে ঝালিয়ে নেয় হেড কোয়ার্টার কম্যাণ্ডের স্পেশ্যাল সার্ভিস ট্রান্সপোর্টেশন ইউনিটে বৃটিশ ডিসপ্যাচ রাইডারদের নামগুলো। অ্যালবার্ট, সিড, ওয়ালি—ওয়ালি হতে পারে—ঐ রকমই গাঁট্টাগোট্টা চেহারা দেখা যাচ্ছে।

রিভলবারধারী কমিয়ে আনছে গতিবেগ। ব্যবধান আর মাত্র পঞ্চাশ গজের। হাওয়ার ধাক্কা ততটা না থাকায় মুখ এখন অবিকৃত। প্রতিটি মাংসপেশী যেন পাথরে কুঁদে গড়া···কঠোর···নির্মম···মমতা-হীন। বন্দুকের নলচের মত লক্ষ্যভেদী তুই কালো চোখের মধ্যে এবার দপ করে জ্বলে উঠল লাল স্ফুলিঙ্গ। চল্লিশ গজ, তিরিশ। ভারি সুন্দর একটা ম্যাগপাই পাখী বনের মধ্যে থেকে হঠাৎ ছুটে এল তরুণ ডিসপ্যাচ রাইডারের সামনে। এঁকে বেঁকে গিয়ে ফের ঢুকে পড়ল ঝোপের মধ্যে। মাইলপোস্টে দেখা গেল সেণ্ট জার্মেন আর বেশী দূরে নেই। মাত্র এক কিলোমিটার। তরুণ চালক নিঃশব্দে হাসল। মনে পড়ল সেই প্রবাদ—একটি মাত্র ম্যাগপাই দেখা মানে দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাওয়া।

বিশগজ পেছনে রিভলবারধারী চালক তু-হাত তুলে নিল হ্যাণ্ডেল-বারের ওপর থেকে। রিভলবার তুলে নলচে রাখল বামবাহুর ওপর এবং ট্রিগার টিপল—মাত্র একবার।

তরুণ চালকের তু-হাত এক ঝটকায় উঠে এলো হ্যাণ্ডেলবারের ওপর থেকে। তুটো হাতই একযোগে খামচে ধরল পিঠের পেছনে শিরদাঁড়ার মাঝখানটা। টলমল করে উঠে মাতালের মত রাস্তার ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে ধেয়ে গেল তার মোটর সাইকেল, লাফিয়ে টপকে গেল একটা খানা এবং ঘাড় মুচড়ে আছড়ে পড়ল ঘাসফুল-ছাওয়া মাঠে। পরক্ষণেই আর্তনাদ করে পেছনের ঘুরন্ত চাকার ওপর দাঁড়িয়ে উঠল দ্বি-চক্রযান এবং ধীরে ধীরে এসে পড়ল মৃত চালকের গায়ে। বেশ কিছুক্ষণ প্রচণ্ড শব্দ, ভয়ানক ঝাঁকুনি এবং তরুণ চালকের পোশাক ও ঘাসফুল দলাই-মলাই করার পর আস্তে আস্তে নীরব হয়ে গেল বি. এস. এ-র তর্জন-গর্জন।

বোঁ করে ঘুরে গেল হত্যাকারী। যেদিকে এসেছিল, সেইদিকেই মোটর সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে দাঁড় করাল রাস্তার পাশে। এক

লাথিতে হুইলরেস্ট নামিয়ে টান মেরে দাঁড় করিয়ে দিল ইস্পাতের যন্ত্রযান। তারপর ধীরপদে বুনোফুল মাড়িয়ে আর দীর্ঘচ্ছন্দ গাছের তলা দিয়ে এসে দাঁড়াল মৃতের পাশে। বসল হাঁটু গেড়ে। টান দিয়ে ওঠালো লাশের চোখের পাতা। নিষ্প্রাণ তারকা—জীবনের কোন আলোই আর নেই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক হ্যাঁচকায় মৃতের পিঠ থেকে খুলে নিল কালো চামড়ার ডিসপ্যাচ কেস, সার্টের বোতাম খুলে বুকের ভেতর থেকে টেনে বার করল একটা দোমড়ানো চামড়ার মানিব্যাগ। মণিবন্ধ থেকে সস্তার রিস্টওয়াচটা এমন টান মেরে খুলে আনল যে দু-জায়গায় লম্বা হয়ে গেল বেনটেক্সক্রোম ব্রেসলেট।

উঠে দাঁড়াল হত্যাকারী। কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে নিল ডিসপ্যাচ-কেস। রিস্টওয়াচ আর মানিব্যাগটা পকেটে গুঁজতে গুঁজতে কান পেতে কি যেন শুনল। না, অরণ্যশব্দ আর বিধ্বস্ত বি. এস. এ. থেকে উত্থিত ধাতুর পটপট শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। রাস্তার দিকে এগোল হত্যাকারী। ফিরে চলল যে-পথে এসেছে, ঠিক সেই পথেই—অতি সন্তর্পণে এবং টায়ারের ছাপ বাঁচিয়ে। খানার কাছে নরম মাটির সামনে আরো হুঁশিয়ার হল খুনে চালক। তারপর এসে দাঁড়াল মোটর সাইকেলের পাশে। একবার শুধু ফিরে তাকাল ঘাসফুল ছাওয়া উপত্যকার দিকে।

মন্দ না! পুলিশ-কুকুর ছাড়া এ হত্যারহস্যের সমাধান করার ক্ষমতা কারো নেই। দশমাইল রাস্তায় তদন্ত করা মানে কয়েকদিনের ব্যাপার। এসব ব্যাপারে ঝুঁকি কখনো নিতে নেই। চল্লিশগজ দূর থেকেও গুলি চালাতে সে পারত। কিন্তু সাবধানের মার নেই জেনে এগিয়ে এসেছে আরো বিশগজ। আর, ঘড়ি-মানিব্যাগ নেওয়াটা হয়েছে সবচাইতে বুদ্ধিমানের কাজ। বিপথে চালনা করার মোক্ষম 'ফিনিশিং টাচ্'।

খুশি হয়ে হ্যাঁচকা ঠেলা মেরে 'রেস্ট' থেকে মোটর সাইকেল

নামালো লোকটা ; স্মার্ট জকির মতই টুক করে উঠে বসল সিটে এবং সবেগে পদাঘাত করল স্টার্টারের ওপর। খুব আস্তে আস্তে, 'স্কিড' চিহ্ন যাতে না পড়ে, এমনি ভাবে গাড়ির গতিবেগ বৃদ্ধি করতে লাগল রহস্যময় চালক এবং অচিরেই আবার দেখা গেল সিধে সড়ক বেয়ে ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে ফিরে চলেছে একজন, ডিসপ্যাচ রাইডার। হাওয়ার ঝাপটায় আবার প্রকট হয়ে উঠেছে তার দংষ্ট্রা, যেন হাসছে দাঁত খিঁচিয়ে।

হত্যাস্থলের চারদিকে এতক্ষণ যেন শ্বাসরোধ করে দাঁড়িয়েছিল অরণ্যভূমি। এবার, ধীরে ধীরে, আবার বইতে লাগল শ্বাস-প্রশ্বাস, স্পন্দিত হল অরণ্যবক্ষ, ধ্বনিত হল মর্মর-দীর্ঘশ্বাস।

সে-রাতে জেমস বণ্ডের মদ্যপান শুরু হয়েছিল ফোকে-তে। নেশা করার মত কিছু নয়। ফ্রেঞ্চ কাফেতে সিরিয়াসলি মদ খাওয়া খুবই মুস্কিল। ফুটপাতের রোদে বসে তো আর ভড্‌কা-হুইস্কি-জিন গেলা যায় না। আবার কোনো মদ সিরিয়াসলি খাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু নেশা হয় বেজায়, অথচ স্বাদ নেই তেমন। লাঞ্চের ঠিক আগেই গলা ভিজিয়ে নেওয়ার শ্যাম্পেনও আছে কিন্তু রাত হলেই আবার চড়াতে ইচ্ছে যায় একটার পর একটা কোয়ার্ট। এত শ্যাম্পেন খাওয়ার পরিণাম টের পেতে হয় রাত গভীর হলে। পার্নড মন্দ নয়, কিন্তু এ মদ দল বেঁধে না খেলে মেজাজ আসে না। বণ্ডের আবার স্বাদটা যুৎসই লাগে না। জিভে দিলেই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়। এই সব কারণেই বণ্ড পছন্দ করে এমন মদ যা কাফেতে বসে পান করা যায়, যাতে নেশা কম, কিন্তু গানবাজনার সঙ্গে রীতিমত জমে। বিটার কাম্পারি, সিনজানোতে এক চাকলা পাতিলেবু আর সোডা মিশিয়ে খাওয়ার মেজাজই আলাদা। সোডার মধ্যেও জাতভেদ আছে। বণ্ডের পছন্দ পেরিয়ারের সোডা। কেন

না, কমজোরী মদকে সবচাইতে কমদামে জাতে তুলতে হলে দামী সোডা মেশানোই নাকি বুদ্ধিমানের কাজ। বুদ্ধিটা অবশ্য বণ্ডের।

প্যারিসে এলে বারবার এক ঠিকানায় আস্তানা নেয় বণ্ড। খায় একই জায়গায়। মানে, বেশ কয়েকটা বাঁধাধরা ঠিকানার মধ্যেই প্রাত্যহিক প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে থাকে—নড়চড় হয় না। যেমন, ওঠা চাই টার্মিনাস নর্ড-য়ে। কেন না, স্টেশন হোটেল বণ্ডের এমনিতেই পছন্দ। তার ওপর এ হোটেলের নাম বিশেষ কেউ জানে না, ভড়ংও কম। খাওয়া চাই কাফে ডি লা পে, রোটোণ্ডে আর ডোর-য়েতে। এ সব জায়গায় খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটা লোককে বেশ দেখা যায়। খাওয়ার স্বাদও বেশ খানদানী। মদে টং হওয়ার ইচ্ছে হলে আসা চাই—হ্যারিজ বারে। এখানকার মদে নেশা তো জমেই, সেই সঙ্গে মনে পড়ে যায় ষোলবছর বয়েসে প্রথম প্যারিস আসার অভিজ্ঞতা। কন্টিনেণ্টাল ডেলী মেল-য়ে পানাগারের বিজ্ঞাপন পড়ে অক্ষরে অক্ষরে তাই মেনে চলেছিল বণ্ড। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলেছিল, 'স্যাঙ্ক রু তো নু'। বলার পর থেকেই শুরু ওর জীবনের এক স্মরণীয় রাতের, যার শেষ হয়েছিল যুগপৎ তুটি জিনিস হারিয়ে—কৌমার্য আর নোটকেস। ডিনার খেতে হলে বণ্ড যায় বড় বড় রেস্তোরাঁয়। যেমন, ভেফোর, কানেটন, লুকাস-কার্টন, কোচন ডি' অর। এখানকার খাওয়া ভাল, টাকার শ্রাদ্ধ অবশ্য হয়। তাতে পরোয়া করে না বণ্ড। ডিনার খেয়ে বণ্ড যায় প্লেস পিডাল-য়ে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার জন্যে। অঘটন কিছু না ঘটলে (হামেশাই যা হয়), হাঁটতে হাঁটতে প্যারিসের পথ মাড়িয়ে ফিরে আসে হোটেলে নাক ডাকিয়ে ঘুমোনোর জন্যে।

আজ রাতে কিন্তু ধূলিধূসরিত ঠিকানা-পঞ্জীর ধার দিয়েও গেলনা বণ্ড। এল মান্ধাতা আমলের বলড্যান্সের আসরে। অস্ট্রো-হাঙ্গারিয়ান সীমান্ত অঞ্চলে একটা সমস্যা সমাধানের ভার ছিল বণ্ডের

ওপর। কিছুই সুরাহা হয়নি। কথা ছিল কয়েকজন হাঙ্গেরিয়ানকে ঘাড় ধরে বার করে দেওয়ার। স্টেশন ফাইভের চাঁইকে গাইড করার জন্যে সরাসরি লণ্ডন থেকে পাঠানো হয়েছিল বণ্ডকে। গোটা অপারেশনের তদারকের ভার ছিল ওর ওপর। ভিয়েনা স্টেশন চটেছে তাইতে। ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে বিস্তর। একজন মারা গেছে ফ্রন্টিয়ার মাইল অঞ্চলে। পরের দিনই লণ্ডন হেডকোয়ার্টারে ফিরে রিপোর্ট দেবার কথা বণ্ডের। মন তাই খারাপ। দিনটা সে তুলনায় সত্যিই ভাল। সারা প্যারিস যেন আরো হাসছে। কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে। বণ্ড তাই ঠিক করেছিল আর একবার টো-টো করে আসবে গোটা সহরে। সঙ্গে একটা রূপসীকে নিতে হবে। ডিনারও খেতে হবে তাকে নিয়ে। রূপসীর চোখে টাকার লালসা-থাকবেই থাকবে। বণ্ড সে পাওনাও মেটাবে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ দিয়ে।

রেস্তোরাঁয় বসে মদের অর্ডার দিয়ে এই সব কপোল-কল্পনা নিয়েই মনে মনে হাসছিল বণ্ড। আষাঢ়ে চিন্তা যাই হোক না কেন, বণ্ড তো জানে প্যারিসে এই তার শেষ লীলাখেলা বলেই এত বাজে চিন্তা আসছে মাথায়। মহাযুদ্ধের পর থেকেই প্যারিস তার দুচক্ষের বিষ। ১৯৪৫-এর পর থেকে প্যারিসে তার একটি দিনও আনন্দে কাটেনি। কাটবে কি করে? শহরের সে রূপ, সে আভিজাত্য যেন লুটেপুটে নিয়েছে মোটরের স্রোত; থাবায় ধরে কাড়াকাড়ি করেছে রাশিয়ান আর রুমানিয়ান, বুলগেরিয়ান আর জার্মান। শহরের যা দেখবার জিনিস, তা যেন চোখেই পড়ে না এদের দৌরাত্ম্যে।

মার্বেল বাঁধানো টেবিলের ওপর সশব্দে ট্রে নামিয়ে রাখল ওয়েটার। খুলে দিল পেরিয়ারের ছিপি। বরফের টুকরো ভর্তি ছোট্ট বালতিটাও রাখল টেবিলে। বণ্ড বরফ তুলে ভাসিয়ে দিল মদের গেলাসে; তারপর সোডা মিশিয়ে তুলল ঠোঁটের কাছে। এক

চুমুকে গলা ভিজিয়ে ধরালো সিগারেট। আজ সন্ধ্যেটা মাটি হল দেখা যাচ্ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়তো আসবে মেয়েটা। কিন্তু খোলস বাদ দিয়ে দেখতে গেলেই ঠকতে হবে। খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে হয়ত বুর্জোয়া ফরাসীদের চামড়া ভিজে-ভিজে, পুরু, লোমকূপের ছেঁদাও বেশ বড় বড়। সোনালী চুল মখমল টুপীর নিচেই কেবল সোনালী, গোড়ায় হয়ত বাদামী আর পিয়ানোর তারের মত কর্কশ। নিঃশ্বাসে নিশ্চয় ভূত তাড়ানো রসুনের বিকট গন্ধ; পেপারমিণ্ট দিয়েও যা নাকি ঢাকা যায় না। ছিমছাম যে তনু দেখে মনে রঙ আসে, হয়ত তা ভেতরে ভেতরে তার আর রবারের বর্ম দিয়ে মোড়া। হয়ত বগুের নোটকেসও চুরি যাবে এ মেয়ের হাতের ম্যাজিকে।

একটা থেঁতোমেতো মিশমিশে কালো গাড়ী রাশিরাশি গাড়ীর স্রোত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে পার্ক করল ধার ঘেঁসে। সঙ্গে সঙ্গে যা হয়, ব্রেকের আর্তনাদ, হর্নের কানফাটা কান্না আর পথচারীদের চীৎকারে সৃষ্টি হল মহাসোরগোলের। কোনো কিছুতেই কর্ণপাত না করে টুক করে নামল একটি মেয়ে, ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এল হন হন করে।

উঠে বসল বণ্ড। কল্পনার যা-যা ভেবেছিল, মেয়েটির মধ্যে সেইগুলি বাদ দিয়ে আর সবই আছে। মাথায় বেশ লম্বা। রেনকোটে তন্বীদেহ ঢাকা থাকলেও চলার ভঙ্গিমা থেকে বেশ বোঝা গেল সৌন্দর্য সে অঙ্গের সর্বত্র। চোখে মুখে খুশী যেন উপচে পড়ছে। সেইসঙ্গে মিশে আছে ডানপিটে-ডানপিটে ভাব। গাড়ী চালানোর বেপরোয়া ধরণ দেখেই অবশ্য তা অনুমান করা যায়। ভিড়ের ধাক্কায় মুখটা ঈষৎ ব্যাজার, দুই ঠোঁট দৃঢ়সংবদ্ধ।

মেয়েটি আসছে এদিকেই কিন্তু বণ্ডের টেবিলে নয় নিশ্চয়। হয়তো অন্য কারো সাথে সাক্ষাতের মতলব নিয়েই আসছে। দেরী

হয়ে গেছে, তাই এত অসহিষ্ণু ভাব। ভালবাসার পাত্রকে দেখতে যারা আসে, এ মেয়ে যেন তাদেরই অন্যতম। এ জাতের মেয়ে একলা কখনো থাকেনা। কপাল খারাপ বণ্ডের। মখমলের বেরে টুপীর তলাতেই ঝিলমিল করছে সোনা-সোনা চুল। আহারে!

মেয়েটা সিধে তাকিয়েছে বণ্ডের পানে। হাসছে……।

বণ্ড সামলে ওঠার আগেই টেবিলের সামনে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল রূপসী। বণ্ডের চমকিত চোখের পানে তাকিয়ে হাসল। বলল—"দেরী হওয়ার জন্যে কিছু মনে করবেন না। বেরুতে হবে এখুনি। অফিস চলুন। ক্র্যাশ ডাইভ।" শেষ শব্দ দুটো প্রায় ফিস ফিস করেই বলল সুন্দরী।

কল্পলোক থেকে একঝটকায় বস্তুলোকে ফিরে এল বণ্ড। এ মেয়ে লাইনের মেয়ে। 'ক্র্যাশ ডাইভ' শব্দদুটো একটা সংকেত, সিক্রেট সার্ভিস ধার করেছে সাবমেরিন সার্ভিস থেকে। এ সংকেতের অর্থ হল সংবাদ মোটেই শুভ নয়। খুবই খারাপ।

পকেট থেকে কিছু রেজগি বার করে টেবিলে ছুঁড়ে দিল বণ্ড। বলল— "বেশ তো, চলুন।" সঙ্গে সঙ্গে উঠল দুজনে। এ-টেবিল ও-টেবিল কাটিয়ে পৌঁছলো ফুটপাতে। মেয়েটির গাড়ী তখনো ট্র্যাফিক অবরোধ করে দাঁড় করানো। পুলিস এখুনি এলো বলে। টুক করে স্টীয়ারিং-এর সামনে বসল সুন্দরী। ইঞ্জিন চালুই ছিল। সেকেণ্ড গীয়ারে দিতেই পিছলে এগিয়ে গেল গাড়ীর স্রোতের সঙ্গে।

আড়চোখে দেখল বণ্ড। ফ্যাকাশে চামড়া মখমলের মতই পেলব। চুল তো নয়, যেন সোনালী রেশম। গোড়া পর্যন্ত সোনালী। বলল—"আসছেন কোত্থেকে? এত তাড়াহুড়োই বা কেন?"

সামনে চোখ রেখে বলল সুন্দরী—"আসছি স্টেশন থেকে। গ্রেড টু অ্যাসিস্ট্যাণ্ট আমি। নাম, মেরী অ্যান রাসেল। ডিউটিতে থাকলে আমার নাম নম্বর সেভেন সিক্সটি ফাইভ। এত তাড়াহুড়ো

কেন, তা জানিনা। হেডকোয়ার্টার থেকে 'এম'-এর পাঠানো সিগন্যালটা শুধু দেখেছি। খুব জরুরী। এখুনি খুঁজে বার করতে হবে আপনাকে। বড়কর্তা বললেন, প্যারিসে এলেই আপনি বাঁধাধরা কয়েকটা জায়গায় নাকি যাতায়াত করেন। ঠিকানার ফিরিস্তিটা ধরিয়ে দিলেন আমাকে আর একটি মেয়েকে।" বলে হাসল রূপসী। "আমি সিধে এলাম হ্যারিজ বারে। ফোকেতে না পেলে অন্য রেস্তোঁরায় যেতাম।"

বণ্ড বলল—"ফাইন। আমার সঙ্গে মেয়ে বান্ধবী থাকলে কি করতেন শুনি?"

হেসে ফেলল রূপসী—"তাকে আমার গাড়িতে তুলতাম। আপনাকে ওঠাতাম ট্যাক্সিতে।"

"বুদ্ধির জাহাজ দেখছি। সার্ভিসে আছেন কদ্দিন?"

"পাঁচ বছর। স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ এই প্রথম।"

"কাজকর্ম লাগছে কিরকম?"

"ভালই। ছুটির দিন আর সন্ধ্যেগুলো যেন কাটতেই চায়না। প্যারিসে বন্ধু জোটানো সহজ", বলে মুখভঙ্গী করল সুন্দরী। "কিন্তু কিছুই চায়না, এমন বন্ধু পাওয়া দুর্ঘট। বাসে চড়াও ঝামেলা। পেছন থেকে চিমটি কেটে কেটে কালসিটে ফেলে দ্যায়। তাই বাসে চড়া ত্যাগ করলাম। কিনলাম এমন একটা বদখৎ গাড়ী যার ধারে কাছে কেউ গাড়ী ভেড়াতে চায়না। তফাতে থাকে সবসময়ে।"

কথাটা যে কতখানি সত্যি, তা প্রমাণ করবার জন্যেই যেন রণ্ড পয়েণ্টে এসে সহসা বেলাইনে গাড়ী হাঁকাল সুন্দরী। সঙ্গে সঙ্গে দুভাগ হয়ে গেল গাড়ীর স্রোত, পথ ছেড়ে দিল ওর ভাঙাচোরা ত্যাবড়ানো গাড়ীকে। গাড়ী ঢুকলো এভিন্যু-ম্যাটিগননে।

বণ্ড বললে—"বাঃ, কিন্তু এ কায়দা সব সময়ে খাটাতে যাবেন না।"

"ডিউটিতে থাকলেই খাটাতে হয়, নইলে নয়।" বলতে বলতে

গাড়ী এসে দাঁড়ালো সিক্রেট সার্ভিসের প্যারিস সদর দপ্তরের সামনে।

নামল বণ্ড, বলল—"কাজ মিটলে আপনার দর্শনলাভ ঘটবে তো ? ভয় নেই, চিমটি আমি কাটিনা। তবে আপনার মতই বড্ড একঘেয়ে লাগছে প্যারিসকে।"

নীল-নীল রূপসী-চক্ষু ঈষৎ বিস্ফারিত হল—"সানন্দে।"

খিলেন পেরিয়ে হেডকোয়ার্টারে প্রবেশ করল বণ্ড। এফ স্টেশনের হেড, মানে, উইং কম্যাণ্ডার র‍্যাটরে মানুষটি একটু স্থূলকায়। গোলাপী গাল, সাদা-সাদা চুল ব্যাকব্রাশ করা পেছনে। একটু সৌখীন পোষাকে অভ্যস্ত। চেহারায় চালচলনে মনে হতে পারে ভালমন্দ আর সুখাদ্য নিয়েই বুঝি তাঁর জগৎ। কিন্তু নীলচে আর ধূর্ত চোখদুটিই ধরিয়ে দেয় বাইরের ছলনাটুকু। দারুণ ধূমপানের অভ্যাস ভদ্রলোকের। অফিসঘরে টেঁকা দায় তাম্রকূটের উৎকট গন্ধে। বণ্ডকে দেখতেই যেন হাঁফ ছাড়লেন। বললেন—"কে পাকড়াও করল ?"

"রাসেল। ফোকেতে। নতুন মনে হল ?"

"মাসছয়েকের পুরোনো। কাজ ভালই করছে। যাক, আগে কাজের কথা", বলে ইণ্টারকমের সুইচ টিপে হুকুম দিলেন—"লণ্ডন হেডকোয়ার্টারে 'এম'-কে খবর পাঠাও। জিরো জিরো সেভেনকে পাওয়া গেছে। কাজ বোঝানো হচ্ছে।" খটাং করে বন্ধ হল সুইচ।

তাম্রকূটের ধোঁয়াশা থেকে সরে গিয়ে জানলার সামনে দাঁড়াল বণ্ড। আধঘণ্টা আগেও একঘেয়ে লাগছিল প্যারিসকে, এখন আর তেমন লাগছে না।

হেড অভ এফ বললেন—"গতকাল সকালে একটা খুন হয়েছে। সেণ্ট জার্মেন স্টেশনে যাওয়ার সময়ে পেছন থেকে গুলি খেয়েছে

ডিসপ্যাচ রাইডার। ডিসপ্যাচ কেসে অনেক গোপনীয় দলিল ছিল। খোয়া গেছে সেই কেস, ঘড়ি আর মানিব্যাগ।"

বণ্ড বলল—"কি মনে হয় আপনার, মামুলী রাহাজানি? না, ঘড়ি আর মানিব্যাগ নেওয়া হয়েছে শুধু চোখে ধূলো দেবার জন্যে?"

"বলা মুস্কিল। সিকিউরিটি এখনো ভাবছে। সকাল সাতটা নাকি রাহাজানির সময় নয়। যাক, আপনিতো যাচ্ছেন, গিয়ে কথা বলুন। আপনি যাচ্ছেন 'এম'-এর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে। খুব ভাবনায় পড়েছেন ভদ্রলোক," বলে একটা ম্যাপ বিছিয়ে ধরলেন এফ-এর চাঁইমাথা। "এই হল ভার্সাই। পার্কের উত্তরে এই যে চারমাথা—এখানে কাটাকুটি হয়েছে দুটি রাস্তার—প্যারিস-মন্তেজ আর ভার্সাই মোটররাস্তা। আরো শ'খানেক গজ উত্তরে যান। 'ন্যাটো' গোষ্ঠীর শাখা 'শেপ' এর ঘাঁটি। প্রতি বুধবার সকাল সাতটায় 'শেপ'-এর ঘাঁটি থেকে বেরোয় একজন স্পেশাল সার্ভিস ডিসপ্যাচ রাইডার। সঙ্গে থাকে সাপ্তাহিক গোপনবার্তা। সেণ্ট জার্মেন-এর বাইরে এই যে ছোট্ট গাঁ-টা দেখছেন, এইখানে আমাদের হেডকোয়ার্টারে কাগজপত্র তুলে দিয়ে সাড়ে সাতটার সময়ে ওকে আবার ফিরে যেতে হয় 'শেপ' সদর দপ্তরে। সাবধানের মার নেই, তাই সোজা রাস্তায় না গিয়ে ওর ওপর অর্ডার আছে 'এন ৩০৭' রাস্তা ধরে সেণ্ট জার্মেন-এর জঙ্গল পেরিয়ে ঘাঁটিতে পৌঁছানোর। দূরত্ব প্রায় বারো কিলোমিটার। মোটর সাইকেলে যেতে সময় লাগে খুব জোর পনেরো মিনিট। গতকাল সকালে কর্স অভ সিগন্যালের করপোর্যাল বেট্‌স গিয়েছিল ডিসপ্যাচ কেস নিয়ে। মজবুত মানুষ। কিন্তু সাতটা পঁয়তাল্লিশেও না ফিরে আসায় পাঠানো হল আরেকজনকে। সে গিয়ে দেখল, বেট্‌স রাস্তাতে নেই, ঘাঁটিতেও পৌঁছোয়নি। সওয়া আটটায় সিকিউরিটি ব্রাঞ্চ গা ঝাড়া দিল। নটায় বন্ধ হল রাস্তা। পুলিশ আর সার্চ পার্টি তন্নতন্ন করে খুঁজল সারাদিন। সন্ধ্যে ছটা নাগাদ

পুলিশ কুকুর পেল বেট্‌স-এর লাশ। ততক্ষণে রাস্তার সূত্র মুছে গেছে গাড়ি ঘোড়ার যাতায়াতে।" বলতে বলতে ম্যাপটা মুড়ে বণ্ডের হাতে তুলে দিলেন এফ-কর্তা। "বিমান ঘাঁটি, জাহাজঘাটা, সীমান্ত, সব জায়গাতেই পাহারা বসেছে। কিন্তু এ কাজ যদি পাকা হাতের হয়, তাহলে গোপন দলিলের বাণ্ডিল দুপুরের আগেই দেশছাড়া হয়েছে, অথবা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্যারিসের কোনো দূতাবাসে ঠাঁই পেয়েছে।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বণ্ড বললে—"তা তো বটেই! কাজেই আমি গিয়ে করব কি? খামোকা সময় নষ্ট। এ কাজ আমার নয়। 'এম' ভেবেছেন কি?"

সহানুভূতির হাসি হেসে বললেন এফ-কর্তা—"সত্যি বলতে কি একই কথা 'এম'কে আমি বলেছিলাম। উনি বললেন, জেমস বণ্ডের চোখে অদৃশ্য সূত্রও ধরা পড়ে। সবকটা ঘাঁটির কড়া পাহারার মধ্যেও যখন এ কাণ্ড ঘটে গেল, তখন বুঝতে হবে, এমন একজন ছদ্মবেশী শত্রু সেখানে রয়েছে যাকে কেউই লক্ষ্য করছে না। সে হতে পারে মালী, কি পিওন, কি আর্দালী। ওকে যখন হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে, তখন সে যাক। আমি বলেছিলাম, সবরকম অদৃশ্য সূত্রের কথাই 'শেপ' ভেবেছে। উনি বললেন, পুঁথিগত বিদ্যের দৌড় ওঁর জানা আছে। বলেই লাইন কেটে দিলেন।"

হেসে ফেলল বণ্ড মনের চোখে ভেসে উঠল এম-এর ভ্রূকুটি। মুখে বলল—"দেখি তাহলে কি করা যায়। রিপোর্ট দেব কাকে?"

"রাসেলকে। চব্বিশঘণ্টাই পাওয়া যাবে ওকে। তাছাড়া আপনাকে তো রাসেলই খুঁজে এনেছে। আপনার ধাতও বুঝে ফেলেছে নিশ্চয়। চলবে?"

"চলবে।"

মোটর রাস্তায় গিয়ে ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে গাড়ী হাঁকালো বণ্ড। যথাসময়ে 'শেপ'এর হেডকোয়ার্টারে পেঁৗছে ব্রেক কষলো প্রথম চেক পয়েণ্টে। এগিয়ে এল একজন আমেরিকান পুলিশম্যান। পরনে ধূসর ইউনিফর্ম। বণ্ডের পাশ পরীক্ষা করে ছেড়ে দিল। তার পরেই পাশ পরীক্ষা করল একজন ফরাসী পুলিশম্যান, বোর্ডে ক্লিপ দিয়ে আঁটা ফর্মে লিখে নিল খুঁটিনাটি। প্লাস্টিক উইণ্ডস্ক্রীনে নাম্বার লাগিয়ে ওকে ঢুকতে দিল ভেতরে।

কার-পার্কে গাড়ী দাঁড় করাচ্ছে বণ্ড, এমন সময়ে নাটকীয় ভাবে ভোজবাজীর মত দপ করে জ্বলে উঠল সারি সারি আর্কল্যাম্প। বণ্ডের সামনের রাস্তা নিমেষে যেন দিন হয়ে গেল। নিজেকে দিগম্বর মনে হল বণ্ডের। নুড়ি বিছানো পথ মাড়িয়ে একলাফে সিঁড়ির চারটে ধাপ পেরিয়ে চওড়া দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনীর সুপ্রীম হেডকোয়ার্টারে। এবার পাশ পরীক্ষা করল আমেরিকান আর ফরাসী মিলিটারী পুলিশ। লাল টুপী পরা একজন বৃটিশ এম-পি ওকে নিয়ে গেল সুদীর্ঘ করিডর দিয়ে। দুপাশে সারি সারি অফিসের দরজা।

একটা দরজায় লেখা 'কর্ণেল জি. এ. স্ক্রাইবার, চীফ অভ সিকিউরিটি, হেডকোয়ার্টার্স কম্যাণ্ড'। ভদ্রলোক মাঝবয়েসী, বাঁশের মত শক্ত মজবুত সিধে চেহারা, জাতে আমেরিকান। পাক ধরেছে চুলে। কথাবার্তা হাবভাব বিনয়-বিগলিত—যেন ব্যাঙ্ক ম্যানেজারীতে পোক্ত মানুষটি। রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা ফ্যামিলি ফোটোগ্রাফ বসানো টেবিলে। ফুলদানিতে সাদা গোলাপ। ঘরে তাম্রকূটের গন্ধ একেবারেই নেই। নিরাপত্তার চুলচেরা ব্যবস্থার তারিফ করল বণ্ড কর্ণেলকে—অভিনন্দন জানিয়ে বলল—"বারে বারে এই যে চেকিং, এর ফলে পঞ্চমবাহিনী এখানে নাক গলাতে সাহস পাবে না। এর আগে এরকম ঘটনা

কখনো ঘটেছে ? মানে, কেউ চড়াও হয়েছিল কি ? দলিল-টলিল খোয়া গেছে ?”

“কোনোটাই হয় নি, কম্যাণ্ডার, আমার এ হেডকোয়ার্টার নিয়ে আমি নিশ্চিন্ত, কিন্তু বাইরের ঘটনাগুলো নিয়েই যত ভাবনা। আপনাদের সিক্রেট সার্ভিসের স্থানীয় দপ্তর ছাড়াও আমাদের ছাড়া-ছাড়া সংকেত কেন্দ্র রয়েছে অনেকগুলো। চোদ্দটা বিভিন্ন জাতির হোম মিনিস্ট্রি তো রয়েছেই। কাজেই কোত্থেকে কি খবর বেরিয়ে যাচ্ছে, সে হিসেব রাখা আমার সাধ্য নয়।”

সায় দিল বণ্ড—“তাতো বটেই ! উইং কম্যাণ্ডার ব্ল্যাটারে'র সঙ্গে আপনার কথাবার্তার পর নতুন কিছু ঘটেছে ?”

“বুলেটটা পাওয়া গেছে। আর্মি বুলেট, লাগার। শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গেছে। খুব সম্ভব তিরিশ গজ দূর থেকে ছোঁড়া হয়েছে, গজ দশেক কম বেশী হতে পারে। যদি ধরে নেওয়া যায়, এঁকেবেঁকে না চলে সিধে চলেছিল আমাদের ডিসপ্যাচ রাইডার, তাহলে ধরতে হবে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় ছোঁড়া হয়েছে বুলেটটা। যেহেতু রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফায়ারিংএর প্রশ্ন উঠছেই না, সুতরাং নিশ্চয়ই কোনো গাড়ীতে চেপে পিছু নিয়েছিল হত্যাকারী।”

“সেক্ষেত্রে ড্রাইভিং আয়নায় তাকে নিশ্চয় দেখতে পেয়েছে আপনার লোক ?”

“খুব সম্ভব দেখেছিল।”

“কেউ পিছু পিছু আসছে জানতে পারলে, চোখে ধূলো দেওয়ার জন্যে বিশেষ কোনো নির্দেশ কি আপনার লোকজনদের দেওয়া হয় ?”

“হয় বৈকি।” মৃদু হেসে বললেন কর্ণেল। “বলা হয় টপ-স্পীডে ঝড়ের মত হাওয়া হয়ে যেতে।”

“আপনার লোকটি কত স্পীডে আছাড় খেয়েছে ?”

"খুব বেশী নয়; বিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। কী বলতে চান বলুন তো?"

"খুনটা পাকা হাতের কি সৌখীন হাতের, এ বিষয়ে আপনারা মনস্থির করতে পেরেছেন কিনা জানিনা। কিন্তু আমি পেরেছি। ধরে নিচ্ছি আয়নার বুকে পেছনের আততায়ীকে দেখেছিল আপনার লোক, এবং দেখবার পরেও সে স্পীড বাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করেনি। সুতরাং আমরা অনায়াসেই বলতে পারি, পেছনের লোকটাকে সে শত্রু হিসেবে দেখেনি, দেখেছে বন্ধু হিসাবে। তা থেকে আমরা পাচ্ছি কি? আততায়ী এমন একটা ছদ্মবেশ নিয়েছিল, যা ওই পরিবেশে এমন কি অত সকালেও, অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে আপনার লোকের কাছে।"

ধীরে ধীরে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে উঠল কর্ণেলের মসৃণ ললাটে। বললেন ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে—"কম্যাণ্ডার, আপনি যে পয়েণ্টটা বললেন, এ নিয়েও ভেবেছি আমরা। গতকাল দুপুরে—কম্যাণ্ডিং জেনারেল জরুরী নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটি কমিটি তৈরী হয়ে গেছে। সেই মুহূর্ত থেকে কোনো সম্ভাবনাই বিবেচনা করতে বাকি রাখিনি আমরা। কম্যাণ্ডার," একহাত শূন্যে তুলে গভীর প্রত্যয়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ আবার ব্লটিং প্যাডের ওপর নামিয়ে আনতে আনতে বললেন কর্ণেল—"কেসটা সম্বন্ধে আমরা যা ভেবেছি, তাছাড়াও মৌলিক কোনো পয়েণ্ট যদি কারো মাথায় এসে থাকে তো বলতে হবে, মগজের গ্রে ম্যাটারের দিক দিয়ে তিনি আইনস্টাইনের সমতুল্য। নতুন করে ভাববার, নতুন করে আলোচনা করবার মত কোনো বিষয়ই আর নেই এ কেসে।"

এবার সহানুভূতির হাসি হাসল বণ্ড। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল—"সেক্ষেত্রে আজ রাতে আপনার আর সময় নষ্ট করতে চাই না। আপনাদের আলোচনার পুরো রেকর্ডগুলো যদি দেখতে

দেন তো কেসটা সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হতে পারি। দয়া করে আপনাদের ক্যান্টিন আর গেস্ট কোয়ার্টার দেখিয়ে দিতে বলবেন কাউকে ?”

“নিশ্চয়, নিশ্চয়।” ঘণ্টা টিপে ধরলেন কর্ণেল। কদম ছাঁট এক ছোকরা প্রবেশ করতেই বললেন—“প্রক্টর, কম্যাণ্ডারকে ভি. আই. পি. কোয়ার্টারে নিয়ে যাও। ঘর দেখিয়ে বার আর ক্যান্টিনে নিয়ে যেও।” তারপর বণ্ডের দিকে ফিরে—“খেয়ে দেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন। কাগজপত্র বার করে রাখছি, এ অফিসেই পাবেন। অফিসের বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, তাহলেও আপনার যা-যা দরকার প্রক্টরকে বলবেন, এনে দেবে।” হাত বাড়িয়ে দিয়ে—“ঠিক আছে ? কাল সকালে আবার দেখা হবে।”

গুড নাইট জানিয়ে কদমছাঁট ছোকরার পেছন পেছন বেরিয়ে এল বণ্ড। সুদীর্ঘ করিডর বরাবর হাঁটতে হাঁটতে মনটা আবার দমে গেল। জীবনে অনেক বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকি সে মাথা পেতে নিয়েছে। কিন্তু এরকম অসহায় কখনো বোধ করেনি। আশার এতটুকু রশ্মি নেই কোথাও। চৌদ্দটা দেশের জাঁদরেল সিকিউরিটি ব্রেনরা যেখানে নাজাহাল হয়ে গেছে, সেখানে তার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির এই হঠকারিতা চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। ভি. আই. পি. কোয়ার্টারের স্পার্টান বিলাসিতা আর মোগলাই স্বাচ্ছন্দ্যে শয়ন করে বণ্ড সে রাত্রে মনে মনে হিসেব করে নিল, আরো দিন দুয়েক কেসটা নিয়ে সে মাথা ঘামাবে, মেরী অ্যান রাসেলের সঙ্গসুখ উপভোগ করবে, তার পর গুটোবে পাততাড়ি। ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেল বণ্ড।

দুদিন নয়, চারদিন পর যখন ভোরের আলো ফুটে উঠল সেণ্ট জার্মেন জঙ্গলের মাথায়, দেখা গেল একটা মস্ত ওক গাছের ইয়া মোটা

শাখায় শুয়ে আছে জেমস বণ্ড। নজর রয়েছে বনতলের একটুকরো সতৃণ সবুজ ভূমিখণ্ডের ওপর। বনভূমির চারিদিকেই ঘন জঙ্গল, একপাশে ডি ৯৮ সড়ক—যে সড়কে ক'দিন আগেই একটা মানুষ খুন হয়ে গেছে।

বণ্ডের আপাদমস্তক বিচিত্র পোশাকে আচ্ছাদিত। ছত্রীবাহিনীর দুঃসাহসী সৈনিকরা শত্রু অঞ্চলে নামবার আগে এধরনের পোশাক পরে নেয়—সারা অঙ্গে সবুজ, বাদামী আর কালোর ছোপ আর ডোরা—গাছের পাতার সঙ্গে মিশে থেকে শত্রুর শ্যেন দৃষ্টিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর অপকৌশল। দু-হাতও ঢাকা এই একই রঙের পোশাকে। মাথার ওপর একটা 'হুড'। চোখ আর মুখের জন্যে শুধু দুটো ফুটো সেই মুখোশে। শত্রুকে ধাপ্পা দেওয়ার পক্ষে অভিনব ক্যামোফ্লেজ সন্দেহ নেই। সূর্য উঠলে এ ধাপ্পা আরো নিখুঁত হয়ে ওঠে। তখন আরো গাঢ় হয়ে ওঠে ছায়া এবং গাছের ঠিক নিচে দাঁড়িয়েও গাছের ওপরে ঘাপটি মেরে থাকা উর্দিপরা মানুষটিকে কেউ দেখতে পায় না।

'শেপ' সিকিউরিটিতে দু-দুটো দিন বেবাক নষ্ট হয়েছে। তার বেশী কিছু আশাও করেনি বণ্ড। লাভ কিছুই হয়নি, নতুন কোনো তথ্য আবিষ্কার করতে পারেনি সে, বরং দুর্নাম কুড়িয়েছে বিস্তর। এক প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞেস করার ফলে, যে তদন্ত একবার হয়ে গেছে ফের তার ওপর নতুন জেরা শুরু করার ফলে অপ্রিয় হতে হয়েছে অনেকের। ডবল চেকিং কারই বা পছন্দ হয়। তৃতীয় দিন সকালেই সরে পড়বার মতলব আঁটছিল বণ্ড; ভাবছিল যাওয়ার আগে একটা টেলিফোন করে যাওয়া যাক কর্ণেলকে, এমন সময়ে কর্ণেল নিজেই টেলিফোন করলেন তাকে। বললেন—"কম্যাণ্ডার, ভাবলাম খবরটা আপনাকে দেওয়া দরকার। কাল শেষরাতের দিকে পুলিশ-কুকুরের শেষ দলটাও ফিরে এসেছে। গোটা জঙ্গলটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলে

রহস্যের কিনারা করা যাবে বলে আপনি যে থিওরী পেশ করেছিলেন, তারও ইতি হল সেই সঙ্গে।” দুঃখিত স্বরটা কিন্তু মোটেই দুঃখিত ঠেকল না বণ্ডের কানে—“কিছুই পাওয়া যায় নি। কিস্‌সু না।”

“মিছেই সময় নষ্ট করলাম,” কর্ণেলের মেজাজ খিঁচড়ে দেওয়ার জন্যে ইচ্ছে করেই বাঁকা সুরে বলল বণ্ড—“পুলিশ-কুকুরের ডিউটি অফিসারকে পেলে দুটো কথা জিজ্ঞেস করতাম।”

“নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপনার সব ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। ভাল কথা, কম্যাণ্ডার, এখানে আর কদিন থাকার প্রোগ্রাম আছে আপনার জানতে পারলে ভাল হয়। আরও কিছুদিন আপনার সঙ্গ পেলে খুশী হতাম। কিন্তু সমস্যা হয়েছে আপনার ঘরটা নিয়ে। হল্যাণ্ড থেকে নাকি একটা বড় পার্টি আসছে দিন কয়েকের মধ্যেই। টপ-লেভেল অফিসার। শুনলাম, আপনার ওখানে জায়গার বড় অভাব।”

কর্ণেলের সঙ্গে ঘরকন্না যে মোটেই জমবে না, বণ্ড তা আঁচ করেছিল আগেই। তাই কথাটা শুনে টেলিফোনেই অমায়িক হাসি হেসে বললে—“তা বেশ, তা বেশ, আমি বরং আমার চীফকে একবার ফোন করে নিই। উনি কি বলেন শুনে আপনাকে ফোন করছি।”

“দয়া করে তাই করুন।” একই রকম অমায়িক সুরে জবাব দিলেন কর্ণেল, এবং একই সঙ্গে সশব্দে রিসিভার নামল দুজনের।

চীফ ডিউটি অফিসার জাতে ফরাসী। ধূর্ত চোখ। কুকুরের আস্তানায় গিয়ে দেখা করল বণ্ড। কিন্তু লোকটির বেশী খাতির দেখা গেল অ্যালসেসিয়ানদের সঙ্গে—মধুর সঙ্গ ছেড়ে নড়তেই চায় না। ঘেউ-ঘেউ আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে দেখে বণ্ড তাকে নিয়ে এল ডিউটি রুমে। ছোট ঘর। হুক্ থেকে ঝুলছে দূরবীন, ওয়াটারপ্রুফ, গামবুট, কুকুর খেদানোর খোঁচা, এবং আরো কত কি টুকিটাকি জিনিস। টেবিলে বিছোনো সেণ্ট জার্মেন জঙ্গলের একটা বড় সড় ম্যাপ। পেন্সিল দিয়ে চৌকোনা খুপরিতে দাগানো ম্যাপটা

দেখিয়ে বলল ডিউটি অফিসার—"প্রতি বর্গইঞ্চি জায়গা খুঁজে এসেছে আমাদের অ্যালসেসিয়ান দল। কিচ্ছু পাওয়া যায় নি।"

"আপনি কি বলতে চান কোথাও এদের চেন টেনেও ধরা হয়নি?"

মাথা চুলকে বলল ডিউটি অফিসার—"না, তা অবশ্য বলতে চাই না। দু-একটা খরগোস নিয়ে দাপাদাপি শুরু করেছিল হতভাগারা। একবার একজোড়া শেয়ালও দেখেছিল। মৃগয়া-খেলা হয়েছিল বলতে পারেন মঁসিয়ে। চেন টেনে সরিয়ে নিয়ে যেতে বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়েছিল আমাদের। খুব সম্ভব জিপসীদের গন্ধও পেয়েছিল কুকুরগুলো।"

"ও!" খুব উৎসাহিত বোধ করল না বণ্ড। "জিপসীদের কোথায় দেখেছিলেন? ম্যাপের ওপর দেখান।"

আঙুল দিয়ে জায়গাটা দেখালো ডিউটি অফিসার—"নামধাম গুলো নেহাৎই সেকেলে। এই হল ইটয়েল পারফেট। খুন যেখানে হয়েছে, এই দেখুন সেই জায়গা—ক্যারিফোর দ্য কুরী। এই যে এখানে ত্রিভুজের তলায় ক্যারিফোর রয়াল। যে রাস্তায় খুন হয়েছে, তাকে আড়াআড়িভাবে ক্রশ করেছে এই ক্যারিফোর রয়াল।" পকেট থেকে একটা পেন্সিল বার করে ক্রশ চিহ্নের ঠিক মাঝখানে একটা ফুটকি দিয়ে বলল—"মঁসিয়ে এই হল ফাঁকা জায়গাটা। পুরো শীতকালটা একটা জিপসীদল আড্ডা গেড়েছিল এখানে। ক্রশ রোডের ঠিক ধারেই। ওরা গেছে গত মাসে। জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে বটে, কিন্তু জিপসী কুকুরের গন্ধ এখনও মাস কয়েক থাকবে।"

কুকুরগুলো দেখল বণ্ড। সবাই যেন নেকড়ের বাচ্চা। তারপর ডিউটি অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়ে টুকটাক কয়েকটা জিনিস নিয়ে উঠে পড়ল নিজের গাড়ীতে।

ঝড়ের বেগে সেণ্ট জার্মেন বনরক্ষক অফিসে পৌঁছতে দেরী হল না। ওরা বললে, "জিপসীরা সত্যিই ছিল এখানে। খাঁটি রোমান চেহারা। ফ্রেঞ্চ বলতে পারত না, দু'একটা ভাঙা ভাঙা শব্দ ছাড়া। চালচলন ভালই। কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। উৎপাত করেনি। কারও কোনো নালিশও নেই। ওদের দলে ছিল ছজন পুরুষ, দুজন মেয়ে। কবে গেছে তা কেউ বলতে পারবে না। কেউ দেখেনি। হঠাৎ একদিন জানা গেল জিপসীর দল নেই। হপ্তাখানেক হল গেছে। জায়গাটা কিন্তু পছন্দ করেছিল ভালই। দিব্বি নিরিবিলি।"

কুখ্যাত ডি-৯৮ রাস্তা ধরেই জঙ্গলের মধ্যে গাড়ী হাঁকাল বণ্ড। দূর থেকে মোটর রাস্তার ব্রীজ দেখা যেতেই গতিবৃদ্ধি করে সিকি মাইল থাকতে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। নিঃশব্দে গড়িয়ে চলল গাড়ী। গড়াতে গড়াতে গাড়ী এল ক্যারিফোর রয়ালে। ব্রেক কষল ব্রণ্ড। মার্জারের মত শব্দহীন চরণে লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়। নির্জন বনভূমির মধ্যে এতখানি হুঁশিয়ারির জন্য নিজেকে একটু বোকা-বোকাই মনে হল। তবুও পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ে জঙ্গলের মধ্যে। যে ফাঁকা জায়গায় ডেরা নিয়েছিল জিপসীরা, সন্ধানী চোখে উন্মুক্ত সেই অংশ-টুকুই অন্বেষণ করতে থাকে বণ্ড।

বেশী খুঁজতে হয় না। গাছপালার কুড়ি গজ ভেতরেই রয়েছে একখণ্ড সবুজ তৃণভূমি, কিনারায় দাঁড়িয়ে, ঝোপঝাড় আর গাছপালার অন্তরালে থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিল গোটা জমিটার ওপর। তারপর অতি সন্তর্পণে, অত্যন্ত হুঁশিয়ার হয়ে পা দিল জমিতে। সতর্ক পদক্ষেপে পেরিয়ে এসে দাঁড়াল এ দিকের প্রান্তে।

দুটো টেনিস কোর্ট জুড়লে যা হয়, খোলা জায়গাটার মাপ তাই। পুরু গালিচার মতই ঘন ঘাসের স্তরে ঢাকা। শ্যাওলা ফুলও আছে প্রচুর। লিলিজ অভ দি ভ্যালী এবং ব্লুবেলের স্তবক শোভা

পাচ্ছে কিনারা বরাবর গাছের নীচে নীচে। একধারে রয়েছে একটা নীচু ঢিবি। কাঁটাঝোপ আর কাঁটা গোলাপের ঘন ঝোপে আগা-গোড়া ঢাকা। অজস্র ফুল ফুটেছে ঝোপটায়। ঝরা পাপড়ি গড়িয়ে পড়েছে ঢিবির গোড়া পর্যন্ত।

ঝোপটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল বণ্ড। তাতেও মন ভরল না। গোটা ঢিবিটাকে একটা পাক দিয়ে এল। হেঁট হয়ে দেখল শেকড় পর্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখে। কিন্তু মাটির ঢিবি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

শেষবারের মত অণুবীক্ষণ চোখে তন্ন তন্ন করে গোটা মাঠটাকে দেখে নিল বণ্ড। তারপর এসে দাঁড়াল এমন একটা কোণে, যেখান থেকে রাস্তা সব চাইতে কাছে। এখান দিয়ে গাছপালার মধ্যে পথ করে যাওয়া অনেকটা সহজ। এই জন্যেই কি ঘাস জমিতে চলাচলের একটা রেখা ফুটে উঠেছে? ঘাসগুলো যেন দোমড়ানো, লোক চলাচলের আবছা চিহ্ন না?

পথটা জিপসীদের পায়ে পায়েও সৃষ্টি হতে পারে। অথবা বন ভোজনে উৎসাহী তরুণ-তরুণীদের দাপটেও সম্ভব। রাস্তার একদম ধারে দুটো গাছের মাঝ দিয়ে পথটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে।

গুঁড়ি দুটো পরীক্ষা করার জন্যে হেঁট হয়েছিল বণ্ড। ঘ্রাণ নিয়েছিল। তারপর জানু পেতে বসে নখ দিয়ে গুঁড়ির ছাল থেকে তুলে এনেছিল কাদার একটা পাতলা চাপড়া।

কাদার নীচেই গুঁড়ির ওপর একটা সুস্পষ্ট আঁচড়-চিহ্ন। গভীর দাগ। কাদা দিয়ে কায়দা করে লুকোনো দাগটা।

বাঁ-হাতে কাদার চাপড়াটা ধরে থুথু ছিটিয়ে ভিজিয়ে নিল বণ্ড এবং আবার সযত্নে ঢেকে দিল আঁচড়ের দাগটা—যেমন ছিল ঠিক তেমনিভাবে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই সাঙ্গ হল গুঁড়ি পরীক্ষা। দেখা গেল,

এদিকের গুঁড়িতে রয়েছে সবশুদ্ধ তিনটে আঁচড়ের চিহ্ন আর ওদিকের গুঁড়িতে চারটে।

দ্রুত পদক্ষেপে বনভূমি ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল বণ্ড। ঢালু জায়গায় ব্রীজের নীচেই দাঁড় করানো ছিল ওর গাড়ী। ব্রেক ছেড়ে ঠেলা দিতেই গড়িয়ে নেমে এল বেশ খানিকটা। ফাঁকা জায়গাটা থেকে বেশ খানিকটা দূরে না আসা পর্যন্ত ইঞ্জিন চালু করল না, সাহসও হল না।

তাই আবার ফিরে এসেছে বণ্ড, এসেছে সেই নির্জন বনতলে। এবার আর ঘাসের ওপর নয়, গাছের ওপর। এসেছে অনেক আশা নিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এত প্রচেষ্টা ভস্মে ঘি ঢালার সামিল হবে কিনা, সে শঙ্কাটাও মনে আছে। কিছুতেই তাই স্বস্তি পাচ্ছে না বেচারী।

'এম'-এর হুকুমেই ওকে আসতে হয়েছে এখানে। উনি বলেছেন, গন্ধ যখন পাওয়া গেছে, সেই গন্ধ জিপসীদের গন্ধ হলেও জায়গাটা দেখা দরকার। কারণ বণ্ডের রিপোর্টে ছিল, "কুকুরেরা গন্ধ পেয়েছিল জিপসীদের···পুরো শীতকাল কাটিয়ে তারা গেছে গত মাসে···কোনো নালিশ নেই···উধাও হয়েছে রাতারাতি।"

একেই বলে অদৃশ্য সুত্র। অদৃশ্য মানুষের সূত্র। ঘটনার পটভূমিকায় যারা রয়েছে, তারা এতই পরিচিত যে ভুলেও মনে হয় না নাটের গুরু তারাই। ছজন পুরুষ আর দুজন মেয়ে ছিল জিপসীদের দলে। ফরাসী ভাষায় দখল ছিল না বল্লেই চলে। ধোঁকা দেবার মতলব থাকলে জিপসীদের ছদ্মবেশে সুবিধে কিন্তু অনেক। স্থানীয় ভাষা না জানলেও কিছু এসে যায় না। পরদেশী হয়েও তারা পরদেশী নয়—কারণ তারা জিপসী। ওদের কেউ কেউ নাকি ঘোড়ায় টানা ছাউনি দেওয়া গাড়ী চেপে বিদেয় হয়েছে। যারা পুরো শীতকালটা ঘাঁটি গেড়েছিল বনের মধ্যে, তারাই গোপন বিবর বানিয়ে যায়নি

তো? টপ সিক্রেট কাগজপত্র ছিনিয়ে এনে ফের এই গোপন ঘাঁটিতেই ঘাপটি মেরেছে হয়ত ওদেরই সাঙ্গ পাঙ্গ। ঝোপ বুঝে কোপ মারার পক্ষে অভিনব ষড়যন্ত্র সন্দেহ নেই।

কে জানে হয়ত সবটাই বণ্ডের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা, চমকপ্রদ ফ্যানটাসি রচনা। অন্তত এই ধারণা বণ্ডের ছিল সেদিন পর্যন্ত, কিন্তু যখনি গাছের গোড়ায় দেখেছে রহস্যজনক আঁচড়চিহ্ন, তখনি ফ্যানটাসি হয়েছে ফ্যাক্ট, সন্দেহ গেড়েছে যুক্তির শেকড়।

দু-দুটো গাছের গুঁড়ির আঁচড়চিহ্ন অত্যন্ত যত্ন সহকারে কাদামাটি দিয়ে লেপা। সব ক'টা চিহ্নই রয়েছে একটা বিশেষ উচ্চতায়—যে উচ্চতায় ঠেলে-নিয়ে-যাওয়া যে কোনো ধরনের সাইকেল-প্যাডেলের ঘসা লেগেই গাছের ছালে এ আঁচড় লাগা সম্ভব।

হয়ত সমস্তটাই অসম্ভব কপোল-কল্পনা, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষীণ এই সূত্রটাই জেমস বণ্ডের পক্ষে যথেষ্ট।

একটা সমস্যা তবুও খচখচ করতে থাকে মনের মধ্যে। আবার হানা দেওয়ার সাহস কি হবে বিবরবাসীদের? হয়ত একবারই তারা ছোঁ মেরেছে বাজপাখির মত। আর ফিরবে না।

আর যদি তারা দুরন্ত দুঃসাহসী হয়, নিজেদের নিরাপত্তার ওপর প্রচণ্ড আস্থা থাকে, তবে আবার বেরিয়ে আসবে গোপন কন্দর ছেড়ে।

অনুমিতিটা স্টেশন 'এফ' ছাড়া আর কারো কাছে বলেনি বণ্ড। মেরী অ্যান রাসেল সব শুনে হুঁশিয়ার থাকতে বলেছে বণ্ডকে। 'এফ'-এর কর্তা বাজে কথার মানুষ নন। তিনি সেণ্ট জার্মেনে তাঁর ঘাঁটিতে হুকুম পাঠিয়েছেন বণ্ডকে যেন সবরকম সাহায্য করা হয়। কর্ণেল স্ক্রাইবারকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বণ্ড সেণ্ট জার্মেনের গোপন ঘাঁটির ক্যাম্পে ডেরা নিয়েছে। ঘাঁটিটা একটা বেনামী গাঁয়ের পেছনের রাস্তায় বেনামী বাড়ীতে। ক্যামোফ্লেজের ছদ্মবেশ এই ঘাঁটি থেকেই পাওয়া গিয়েছে। সেই সঙ্গে চারজন সিক্রেট সার্ভিসের

জোয়ান। বণ্ডের হুকুম পেলেই তারা আনন্দে আটখানা হয়ে হাত চালাবে। সবারই মনে ইচ্ছে, বণ্ড যদি রহস্যের কিনারা করে 'শেপ' ইনটেলিজেন্সকে উচিৎ শিক্ষা দেয়, তবেই সিক্রেট সার্ভিসের স্বাধীনতা অব্যাহত থাকবে, 'এম'-এর অনেকদিনের দুশ্চিন্তাও যাবে। দর্পচূর্ণ হবে 'শেপ'-এর, গৌরব বাড়বে সিক্রেট সার্ভিসের।

ওক গাছের শাখায় শুয়ে নিজের মনেই হাসল বণ্ড। যুদ্ধ শুধু বাইরে নয়, যুদ্ধ ঘরেও। দুটো দলেরই উদ্দেশ্য এক—শত্রুর উচ্ছেদ। অথচ নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করে কি বিপুল উদ্যমশক্তিরই না অপচয় করছে। নিজেদের মধ্যে আগুন ছোঁড়াছুঁড়ি না করে যদি শত্রুর দিকেই তা নিক্ষিপ্ত হত, তাহলে পঞ্চমবাহিনীর অস্তিত্ব কোন্ কালে মুছে যেত দেশ থেকে।

সাড়ে ছটা বাজে। প্রাতরাশ খাবার সময় হল। সন্তর্পণে বণ্ডের ডানহাত বিচিত্র পোশাকের পকেট হাতড়াতে লাগল এবং তারপরেই উঠে এল মুখের জায়গায় 'হুডের' মত কাটা ফাঁকটুকুর সামনে। রয়ে সয়ে অনেকক্ষণ ধরে চুষল গ্লুকোজ ট্যাবলেটটা। তারপর আর একটা। চোখ কিন্তু সরল না উন্মুক্ত তৃণভূমির ওপর থেকে, লাল কাঠবেড়ালিটা অনেকক্ষণ ধরেই খেলা জুড়েছে ঢিবিটার আশেপাশে, কুটকুট করে খাচ্ছে ছোট ছোট শেকড়। অবশেষে ঢিবির তলায় এসে দু-থাবার মধ্যে নতুন একটা খাদ্যবস্তু ধরে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাই নিয়ে। ঘন ঘাসের মধ্যে হুটোপাটি করছিল একজোড়া বুনো পায়রা। বনভূমির নৈঃশব্দ ভঙ্গ হচ্ছিল কেবল ওদেরই প্রেমকূজনে। একটা কাঁটা ঝোপের ওপর বাসা নির্মাণ করার জন্যে টুকিটাকি বস্তু সংগ্রহে নিদারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল একজোড়া চড়ুই। গোলাপঝোপের ওপর ঐকতান শুরু করে দিল মধুমক্ষিকার দল। দলে ক্রমশ ভারি হচ্ছে ওরা। বিশগজ দূরে থেকে ডালপাতার আড়ালে ওকগাছের শাখায় শুয়ে সমস্তই স্পষ্ট দেখতে পেল জেমস বণ্ড। এ যেন ঠাকুরমার ঝুলি

থেকে আহরণ করা একটা অপরূপ রূপকথা। দীর্ঘ সমুন্নত বৃক্ষের শির ধুইয়ে অরুণ কিরণ স্বর্ণধারার মত ঝরে পড়ছে আশ্চর্য সবুজ ঘাসজমির ওপর, নাচছে ভোমরা, গাইছে পাখি, আনন্দের হিল্লোলে হিল্লোলিত সতেজ ঘাসগুলিও। রাত চারটে থেকে গাছে উঠে ঘাপটি মেরে বসে আছে বণ্ড। রাতের অন্ধকার মিলিয়ে গেলে ভোর যে এমন অপরূপ হয়ে দেখা দেয়, তা এর আগে কখনো এমনভাবে প্রত্যক্ষ করেনি সে।

বিহঙ্গকুলের দৌরাত্ম্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। হতভাগারা ঝটাপটি করতে করতে বণ্ডের মাথায় এসে বসলেই কেলেঙ্কারী!

বিপদজ্ঞাপক সঙ্কেতটা সর্বপ্রথম এল পায়রাদের কাছ থেকে। আচম্বিতে প্রচণ্ড পাখা ঝটপটানির শব্দ তুলে জমি ছেড়ে সবাই আশ্রয় নিল গাছের ডালে। তারপর বাকী পাখিরাও তৃণভূমি ছেড়ে চম্পট দিল গাছ লক্ষ্য করে। সবশেষে ছুটল কাঠবেড়ালির দল।

নীরব হয়ে গেল বনভূমি। গোলাপকুঞ্জের ওপর গুনগুন ভ্রমর-সঙ্গীত ছাড়া আর কোনো শব্দই নেই তৃণভূমিতে। নিঃশব্দ। আশ্চর্য শ্বাসরোধী নিঃশব্দ।

ব্যাপার কি? কিসের জন্য বিপদজ্ঞাপক সংকেত? কি দেখে ভয় পেল নিরীহ পায়রা, পাখি আর কাঠবেড়ালির দল?

ধীরে ধীরে উত্তাল হয়ে উঠতে লাগল বণ্ডের হৃৎপিণ্ড। দূরবীনের মত তীক্ষ্ণ চোখ দুটো তৃণভূমির প্রতি বর্গইঞ্চি স্থান খুঁটিয়ে দেখতে লাগল অস্বাভাবিক কোনো সূত্রের আশায়।

আর, তারপরেই ধড়াস করে উঠল বুকটা।

গোলাপঝোপের মধ্যে কি যেন নড়ছে না?

নড়াটা এত সামান্য, এত অল্প যে ধর্তব্যের মধ্যে নয়! অথচ তা অসাধারণ। ধীরে ধীরে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে, একটিমাত্র কাঁটাবৃন্ত উঠে

আসছে ওপরকার শাখার মাথা ছাড়িয়ে। অস্বাভাবিক রকমের সিধে আর মোটা একটা গোলাপবৃন্ত।

আস্তে আস্তে উঠে আসতে লাগল বোঁটাটা। ঝোপের ফুটখানেক ওপরে না ওঠা পর্যন্ত অব্যাহত রইল উর্ধ্ব গতি। তারপরেই দাঁড়িয়ে গেল।

বোঁটাটার ডগায় একটিমাত্র লাল গোলাপ। ঝোপের ফুটখানেক ওপরে উঠে থাকার জন্যেই বুঝি অস্বাভাবিক লাগছিল গোলাপটা—তা নাহলে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, এ আর এমন আশ্চর্য কি! সিধে ডাঁটার ওপর একটা লাল গোলাপ। প্রকৃতির সৃষ্টিতে কত বৈচিত্র্য আছে—এও তার মধ্যে একটা, তার বেশী কিছু নয়।

কিন্তু এমন সুন্দর গোলাপটির মধ্যেই এবার ঘটল এক অকল্পনীয় পরিবর্তন। আচম্বিতে, অত্যন্ত ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে পাপড়িগুলো কাঁপতে লাগল, আস্তে আস্তে খুলে যেতে লাগল এবং ঝুলে পড়তে লাগল বাইরের দিকে। হলুদ গর্ভকেশর গুটিয়ে সরে গেল পাশে।

আর, সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ল আধুলির মত বড় একটা কাঁচের লেন্সের ওপর।

মনে হল, লেন্সটা যেন সিধে তাকিয়ে রয়েছে বণ্ডের পানেই। কিন্তু পরক্ষণেই আস্তে আস্তে বোঁটার ওপর ঘুরে যেতে লাগল অবিশ্বাস্য এই গোলাপ চক্ষু; অত্যন্ত ধীরে ধীরে পুরো একটা পাক দিয়ে, সমস্ত তৃণভূমি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে, আবার ফিরে তাকাল বণ্ডের পানে।

অবশেষে যেন নিশ্চিন্ত হয়েই আবার পাপড়ি আর গর্ভকেশর-গুলো উঠে এসে ঢেকে দিল কাঁচ-চক্ষু, এবং ধীরে ধীরে নজরে আসে এমনি গতিতে, নেমে গেল বিচ্ছিন্ন বোঁটাটা—মিশে এক হয়ে গেল অন্যান্য বৃন্তের সঙ্গে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে এতক্ষণ পড়ে ছিল বণ্ড। এবার যেন ছিপি-খোলা

সোডার বোতলের মতই পাঁজর খালি করে বেরিয়ে গেল দীর্ঘশ্বাস। ক্ষণেকের জন্য চোখ মুদে জিরেন দিল চোখের টনটনিয়ে ওঠা স্নায়ুগুলোকে।

জিপসী! গোলাপবৃন্তের খোলস ঢাকা কলকব্জা বাউণ্ডুলে জিপসীদের মাথা থেকে বেরোয় না। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানরা মাথা চাড়া দিতে ইংরেজরাও যা বানাতে পারেনি এমন কি জার্মানরা নিজেরাও যে অভিনব যন্ত্র কল্পনাতে আনতে পারেনি, এখানকার তৃণভূমির পাতালপুরীতে তা সৃষ্টি করে গেছে কয়েকজন জিপসী! ঘাস-ছাওয়া মাটির ঢিবির নীচে গর্ভগৃহ থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে গোলাপের ছদ্মবেশ পরানো আশ্চর্য যন্ত্র-চক্ষু! পেরিস্কোপ!

ভয়ের হিমশীতল স্রোত বণ্ডের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যায়। অনুমানটা তাহলে সঠিক! কিন্তু এর পরের দৃশ্যটা কি?

মাটির ঢিবির দিক থেকে এবার ভেসে এলো একটা শব্দ।

অদ্ভুত শব্দ। যেন অতি উচ্চগ্রামে গুন গুন করছে অগুন্তি ভোমরা। অতি-তীব্র এবং সেই কারণেই প্রায়-অশ্রুত পাতলা ভ্রমর গুঞ্জনের সেই অপার্থিব চাপা শব্দটা জাগ্রত হল নিরীহদর্শন গোলাপ কুঞ্জের তলা থেকে।

ইলেকট্রিক মোটর চলার শব্দ। পুরোদমে চলছে মোটর।

আচম্বিতে ঈষৎ কেঁপে উঠল গোটা গোলাপের ঝাড়টা। সদলবলে শূন্যে ছিটকে গেল মধুমক্ষিকাবাহিনী। কিছুক্ষণ ভেসে থাকবার পর আবার নেমে এল গোলাপঝাড়ে।

খুব ধীরে ধীরে, যেন যাদুমন্ত্রবলে, একটা চিড় দেখা দিয়েছে সবুজ ধরিত্রীতে। গোলাপঝাড়ের ঠিক মাঝবরাবর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ফাটলটা। ক্রমশ আরো চওড়া হয়ে যাচ্ছে। মসৃণ গতিতে যেন উন্মোচিত হচ্ছে নাগলোকের পাতাল বিবর।

এবার গোলাপঝাড়ের ছু-পাশ খুলে যাচ্ছে ছু-দিকে—হুবহু ছুপাল্লা দরজার মত। নিবিড় তমসায় ঢাকা রন্ধ্রলোক আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। পাল্লার ভেতরের দিকে ঝুলছে গোলাপের শেকড়, এবং শেকড় সমেত, গোলাপসমেত ভূগর্ভ পুরীর সিং-দরজার বিশাল পাল্লা খুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

আরো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কলকব্জার ভ্রমরগুঞ্জন। ঈষৎ বেঁকানো পাল্লাছুটোর কিনারা ঝিকমিক করছে সূর্যালোকে। ধাতু, চকচকে ধাতুর দরজা। তার ওপর সযত্নে পুঁতে দেওয়া হয়েছে গোলাপঝাড়।

সাবাস বিভীষণবাহিনী! সাবাস তোমাদের শয়তানি বুদ্ধি!

ছু-হাট হয়ে খুলে গেছে ধাতুর দরজা। ছু-পাশে খাড়া হয়ে রয়েছে দ্বিধাবিভক্ত গোলাপকুঞ্জ। নির্বিকার অলিকুল নিশ্চিন্ত মনে তখনও মধু আহরণে ব্যস্ত।

সূর্যের আলোয় এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মাটির তলায় পুরু ধাতুর স্তর। যেন মাটিতে পোঁতা অতিকায় ডিম—যার ওপরটা হঠাৎ ছু-ভাগ হয়ে গেছে ডাকিনী-মন্ত্রে।

বক্র দরজার মাঝে কালো আঁধার পাতলা হয়ে এসেছে ওপরের দিনের আলোয় আর ভেতরের ইলেকট্রিক আলোয়। মোটর চলার ক্রুদ্ধ গজরানি থেমে গেছে। ঝিকিমিকি বিছ্যুৎবাতি আড়াল করে এবার বিবরমুখে আবির্ভূত হল একটা মাথা আর একজোড়া কাঁধ। উঠে আসছে মাথাটা।

যেন একটা মানুষ-চিতা। শব্দহীন সঞ্চরণ। সজাগ চাহনি। সতর্ক পদক্ষেপে উঠে এল একটা লোক। গুঁড়ি মেরে বসল বাঘের মতই। সূচীতীক্ষ্ম চোখ বুলিয়ে নিল সবুজ তৃণভূমির ওপর। লোকটার হাতে একটা রিভলবার।

পর্যবেক্ষণ সন্তোষজনক হল নিশ্চয়। তাই ঘাড় ফিরিয়ে হাতের

ইঙ্গিত করতেই ফাটলপথে উঠে এল আরও একজনের ঘাড় ও কাঁধ। কিম্ভূতকিমাকার তিনজোড়া জুতো প্রথম ব্যক্তির হাতে তুলে দিল দ্বিতীয় ব্যক্তি। এবং পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে গেল রন্ধ্রপথে।

একজোড়া জুতো বেছে নিল প্রথম লোকটা। নিজেই বুটশুদ্ধ পা গলালো তার মধ্যে। ফিতে বাঁধল। আরও সহজভাবে চলাফেরা শুরু হল পাতালবাসীর। কিম্ভূতকিমাকার জুতোর চ্যাটালো শুকতলার নীচে ঘাস ঈষৎ তুমড়ে গিয়েই আবার খাড়া হয়ে যেতে লাগল। জুতোর ছাপের চিহ্নমাত্র পড়ল না কোথাও।

মনে মনে তারিফ না করে পারল না বণ্ড। ধুরন্ধর চক্রী এরা।

বেরিয়ে এল দ্বিতীয় ব্যক্তি—তার পেছনে আরও একজন। দুজনে মিলে পাতাল-গহ্বরের ভেতর থেকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে এল একটা মোটর সাইকেল। কাঁধে চওড়া চামড়ার পটিতে বাইকটা লাগিয়ে ঝুলিয়ে নিল। সিধে হয়ে দাঁড়াতেই প্রথম ব্যক্তি প্রত্যেকের পায়ে বেঁধে দিল সেই বিচিত্র দর্শন জুতো। তারপরে তিনজনেই লাইনে সারিবন্দী হেঁটে চলল রাস্তার দিকে। গাছের ছায়ায় ছায়ায় ভৌতিক মূর্তির মতই এগিয়ে চলল তিনমূর্তি। পা ফেলল অতি সন্তর্পণে। পা তুলল অতি সন্তর্পণে। ভঙ্গিমা দেখে বুঝতে বাকী থাকে না কি তাদের অভিপ্রায়। নিঃশব্দ অভিযানের উদ্দেশ্য অত্যন্ত ক্রুর, অত্যন্ত কুটিল।

অবরুদ্ধ উদ্বেগে এতক্ষণ কাঠ হয়ে শুয়েছিল বণ্ড। এবার পাঁজরা খালি করে বেরিয়ে এল উৎকণ্ঠা হ্রাসের দীর্ঘশ্বাস। ঠায় ঘাড় তুলে থাকার ফলে টনটন করছিল কাঁধের মাংসপেশী; তাই মাথা এলিয়ে জিরেন দিল ঘাড়টাকে।

বটে! এইটেই তাহলে পঞ্চমবাহিনীর গোপনঘাঁটি! সব কটা ছাড়া-ছাড়া ঘটনাই এবার এক সুতোয় গেঁথে যাচ্ছে। মোটরবাইক-বাহী অনুচর দুজনের পরনে ধূসর রঙের ঢিলে আলখাল্লা। কিন্তু

দলনায়ক প্রথম ব্যক্তির পরনে রয়াল কর্স অভ সিগন্যালস-এর ইউনিফর্ম। মোটর-সাইকেলের রঙ অলিভ-গ্রীন—বি. এস. এ. এম-টোয়েন্টি। বৃটিশ আর্মির রেজিস্ট্রেশন চিহ্নিত রয়েছে পেট্রলট্যাঙ্কে।

এরপর আশ্চর্য হওয়ার আর কিছুই রইল না। এই কারণেই অত কাছ থেকে দেখেও নিহত হওয়ার আগে বেচারী ডিসপ্যাচ রাইডার কোনো বদ সন্দেহ করতে পারে নি। ভেবেছে সহকর্মী। কিন্তু টপ সিক্রেট দলিলপত্র নিয়ে এরা এ তল্লাট ছেড়ে যখন বাইরে যায় নি, তখন অনুমান করে নিতে হবে রেডিওর শরণ নিয়েছে। অর্থাৎ, গুপ্ত খবরের সারাংশ নিশুতিরাতে বেতার মারফৎ পাচার করে দিয়েছে আপন ঘাঁটিতে। পেরিস্কোপের বদলে গোলাপের ডাঁটার ছদ্মবেশ পরানো এরিয়েল উঠে এসেছে ঝোপের মধ্যে থেকে। পাতালকক্ষে সচল হয়েছে জেনারেটর এবং ইথারের মধ্যে দিয়ে সাঙ্কেতিক সংবাদ বর্ডার পেরিয়ে গেছে শত্রুপক্ষের ঘাঁটিতে।

সাঙ্কেতিক সংবাদ! বিবর-ঘাঁটিতে যত সঙ্কেত আছে, সবই জানা যাবে বণ্ড যদি একবার ভেতরে ঢোকে। এই সুযোগে কিছু ভূয়ো খবরও পাঠানো যেতে পারে শত্রু-শিবিরে। এদের মূল ঘাঁটি নিশ্চয় রাশিয়ায়—সোভিয়েট মিলিটারী ইনটেলিজেন্স নিয়ন্ত্রণ করছে এই পাতাল ঘাঁটিকে। রেসের ঘোড়ার মত দৌড়োতে থাকে বণ্ডের চিন্তাধারা।

অনুচর দুজন ফিরে আসছে। বিবর-ঘাঁটিতে প্রবেশ করল দুজনে এবং মাথার ওপর আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল গোলাপঝাড়-সমেত আশ্চর্য পাল্লাদুটো। দলপতি মোটর-সাইকেল নিয়ে রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে রইল। ঘড়ির দিকে তাকাল বণ্ড। ছটা পঞ্চান্ন।

বটে! বটে! সকাল সাতটায় আবার নতুন ডিসপ্যাচ রাইডার শিকারের উদ্দেশ্যেই এই অভিযান। হয়তো শিকারী জানে না যে, ডিসপ্যাচ রাইডাররা হপ্তায় একদিনই বেরোয়। জানলেও ভেবেছে,

সগু খুন হয়ে যাবার পর 'শেপ' কর্তৃপক্ষ রুটিন পালটেছে স্রেফ নিরাপত্তার খাতিরে—ডিসপ্যাচ রাইডার নির্দিষ্ট দিনে না বেরিয়ে বেরোবে হয়ত অন্য কোনো দিনে। হুঁশিয়ার লোক বটে! খুব সম্ভব এদের গুপ্তচর-প্রধানের নির্দেশ আছে গ্রীষ্ম আসার আগেই যতখানি সম্ভব কাজ গুছিয়ে নেওয়া। এর মধ্যেই তো টুরিস্ট আসা শুরু হয়ে গেছে—জঙ্গলেও আসছে তারা হল্লোড় করতে। সাবধানের মার নেই। তাই পাতালপুরী বন্ধ রেখেই সরে যাবে নিরাপদ জায়গায়। আবার ফিরে আসবে শীতকালে। আরো কত প্ল্যান থাকতে পারে কুচক্রীদের কে জানে! তবে আরো একটা খুন যে হবেই, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই বণ্ডের।

মিনিটের পর মিনিট কেটে যায়। সাতটা দশের সময় ফিরে এল পালের গোদা। উন্মুক্ত তৃণভূমির কিনারায় একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একবার মাত্র শিস দিল বিচিত্র সুরে। যেন মহা উল্লাসে গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠল সুকণ্ঠি কোন পাখী।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে যেতে লাগল গোলাপঝাড়ের সিংদরজা। বিচিত্র জুতো পরে বেরিয়ে এল তুই অনুচর। দলপতির পিছু পিছু উধাও হল গাছের সারির আড়ালে। ফিরে এল একটু পরেই। তু-কাঁধে চামড়ার ফিতেতে ঝুলছে মোটর সাইকেলটা। বাঘা-চোখে চারপাশ দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হল দলপতি। কেউ কোথায় নেই। আস্তে আস্তে নেমে গেল পাতাল-পথে এবং বিশাল পাল্লা তুটো দ্রুত উঠে এসে বন্ধ করে দিল প্রবেশপথ। গুনগুন করতে লাগল ভোমরার দল। চিহ্ন রইল না কোথাও।

আরো আধঘণ্টা কাঠ হয়ে শুয়ে রইল বণ্ড। বনভূমির স্বাভাবিক প্রাণচাঞ্চল্য আবার ফিরে এসেছে সবুজ ভূমিখণ্ডে। ঘণ্টাখানেক পরে যখন খর সূর্যকিরণে ছায়া আরো গাঢ় হয়ে উঠল, নিঃশব্দে নেমে এল জেমস বণ্ড; সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে শাখার ওপর দিয়ে

পিছলে পিছলে পৌঁছোলো গুঁড়ির কাছে ; টুক করে লাফ দিল শ্যাওলা ঢাকা ঘাসের কার্পেটে, পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে গেল বনচ্ছায়ায়।

সেদিন সন্ধ্যায় সব শুনে চেঁচামেচি শুরু করে দিলে মেরী অ্যান রাসেল। বললে—"আপনার মাথাখারাপ হয়েছে। এ কাজ আপনাকে আমি করতে দেব না। 'এফ'-কর্তাকে দিয়ে ফোন করছি কর্ণেল স্ক্রাইবারকে। এ কাজ 'শেপ'-এর কাজ। আপনার নয়।"

ধাঁ করে বণ্ড বললে—"খবরদার, ও-সব করতে যাবেন না। কাল সকালে ডিউটি ডিসপ্যাচ রাইডারের বদলে আমাকে খুশী মনেই পাঠাতে চেয়েছেন কর্ণেল স্ক্রাইবার। খুশীটা তিনি মুখেও প্রকাশ করেছেন। সুতরাং এ অবস্থায় এর বেশী আর কিছু জানার অধিকার তাঁর নেই। তাছাড়া এ নিয়ে মাথা ঘামানোরও আর ইচ্ছে নেই ভদ্রলোকের। ফাইল বন্ধ করে অন্য প্রসঙ্গ ভাবছেন। যা বলি শুনুন। লক্ষ্মী মেয়ের মত টেলিপ্রিণ্টারে রিপোর্টটা 'এম'-কে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন—"

"গোল্লায় যাক আপনার 'এম'! গোল্লায় যাক আপনার সার্ভিস!" হিস্টিরিয়া রোগিনীর মত চেঁচিয়ে উঠেছে রাসেল। গলায় রাগ আর কান্না মিশেছে একই সঙ্গে, "এ কি ছেলেখেলা হচ্ছে? রেডইণ্ডিয়ান-দের সঙ্গে মেকী লড়াই? একাই একশ হবেন? আসলে আপনি বাহাদুরী দেখিয়ে নাম কিনতে চান।"

বিরক্তি আর চাপতে পারে না বণ্ড। ধমকে উঠে বলে—"হয়েছে, হয়েছে, অনেক হয়েছে! এখুনি টেলিপ্রিণ্টারে পাঠিয়ে দিন রিপোর্টটা। আমার হুকুম।"

আরক্ত মুখে ক্ষণকাল তাকিয়ে যেন হাল ছেড়ে দিল রাসেল—"ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর হুকুম জাহির করতে হবে না। যা করবার আমি করছি। কিন্তু সাবধানে থাকবেন। চোট না লাগে। গুড লাক্।"

"এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা। কাল রাতে খাওয়ার নেমন্তন্ন রইল, কেমন? আরমেনন ভিলেই ভাল। গোলাপী শ্যাম্পেন আর জিপসীর বেহালা বাজনা। প্যারিস মানেই রুটিন বসন্ত। রাজী?"

"মন্দ কী! সুতরাং আরো হুঁশিয়ার হবেন। হবেন তো?"

"বলা বাহুল্য। অযথা ভাববেন না। গুড নাইট।"

"নাইট।"

রাতে শুতে যাওয়ার আগে গোটা প্ল্যানটাকে মনে মনে ঘষে মেজে ঝকঝকে তকতকে করে তুলল বণ্ড। ডিউটি বুঝিয়ে দিল 'এফ' স্টেশনের চার জোয়ানকে।

আর একটি সুন্দর সকাল।

অভিযানের জন্যে তৈরী হচ্ছে জেমস বণ্ড। বেশ জাঁকিয়ে বসেছে বি. এস. এ. মোটর সাইকেলের ওপর। অনতিকাল পরেই দ্বিচক্রযানে চেপে শুরু হবে তার দুঃসাহসের খেলা—জীবন আর মৃত্যুর জুয়োখেলা। পরিণামটা কি তা বণ্ড নিজেও জানে না। ক্যারিফোর রয়ালের রাস্তায় কি যে ঘটবে, তা না জেনেও শান্ত তার লোহার মত স্নায়ু।

ঘুট-ঘুট করে চলেছে মোটর বাইকের ইঞ্জিন। সিগন্যাল কর্সের করপোর‍্যাল বণ্ডের হাতে তুলে দিল শূন্য ডিসপ্যাচ কেসটা। বলল—"আপনাকে দেখে স্যার মনে হচ্ছে রয়াল কর্সেই আপনি জীবন কাটালেন। চুলটা অবশ্য একটু ছাঁটলে ভালো হত। কিন্তু ইউনিফর্মটি যা মানিয়েছে না, খাসা! বাইকটা কিরকম লাগছে, স্যার?"

"স্বপ্নের পক্ষীরাজ। কদ্দিন যে চালাই নি!"

ঘড়ির দিকে তাকালো করপোর‍্যাল। সিগন্যাল দেওয়ার সময় হয়েছে। চোখ তুলে বললে—"সাতটা বাজতে আর দেরী নেই। 'ও কে'!"

বুড়ো আঙুলের ইঙ্গিত পেতেই গগলসটা টেনে চোখের ওপর নামিয়ে দিল বণ্ড। হাত নেড়ে বিদায় জানাল করপোর‍্যালকে, বুটের ঠোক্কর মারল গীয়ারে, কাঁকরবিছানো পথের ওপর দিয়ে সবেগে ঘুরে গিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেল মেন গেটের মধ্যে দিয়ে।

পেরিয়ে গেল ১৮৪ নং রাস্তা, এল ৩০৭ নং সড়ক ; বেলী এবং নয়জি-লেরয়ের মধ্যে দিয়ে সেণ্ট-নম। এখান থেকে আচমকা বাঁক নিলেই ডি. ৯৮ সড়ক—খুনের রাস্তা। ঘাসের পাটির ওপর বাইক দাঁড় করালো বণ্ড। আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল '৪৫ কোল্টের লম্বা নলচেটার ওপর। পেটের কাছে রিভলবার গুঁজে খুলে রাখল জ্যাকেটের বোতাম। এবার রওনা হাওয়া যাক—অন ইওর মার্কস ! গেট সেট...!

চকিত ক্ষিপ্রতায় মোড় ঘুরল বণ্ড এবং নিমেষে গতিবেগ বৃদ্ধি করল ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলে। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে সুড়ঙ্গটা—প্যারিস মোটর চলা রাস্তার সুড়ঙ্গ। পাহাড়ের বুক চিরে সুদীর্ঘ টানেল। দেখতে দেখতে হাঁ বড় হল সুড়ঙ্গের—গিলে ফেলল বণ্ডকে। কানে তালা লাগার উপক্রম হল এক্‌সস্টের প্রচণ্ড শব্দে···যেন মুহুর্মুহু কামান দাগার শব্দ। মিনিটখানেকের জন্যে সুড়ঙ্গ পথের স্যাঁতস্যাঁতে শীতল হাওয়ার ঝাপটা লাগল মুখের ওপর। পরক্ষণেই আবার সূর্যালোক—টানেলের মুখ ছোট হয়ে যাচ্ছে পেছনে। পেরিয়ে এল ক্যারিফোর রয়াল। চোখের সামনে দিগন্ত বিস্তৃত পিচঢালা পথ যেন তেল মাখানো···জ্বলছে সোনা-সোনা রোদে। মাইল দুয়েক পথ জঙ্গল ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। পাতা আর শিশিরের মিষ্টি সৌরভ। গতিবেগ চল্লিশে কমিয়ে আনল বণ্ড। স্পীডের ঝাঁকুনিতে থর থর করে কেঁপে উঠল বাঁহাতের ড্রাইভিং আয়না। আয়নার বুকে দ্রুত অপস্রিয়মাণ গাছের সারি আর সীমাহীন সিধে সড়ক ছাড়া আর কোনো প্রতিবিম্ব নেই। জনশূন্য পথ। হত্যাকারীর ছায়াও নেই কোথাও।

তবে কি ভয় পেয়েছে হত্যাকারী? ঘাপটি মেরে রয়েছে পাতাল-পুরীতে? হয়ত আগে থেকেই চর মারফৎ খবর পৌঁছে গেছে ভূগর্ভ ঘাঁটিতে, তাই আজ বিবর মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে পাতালকেতু।

ওকি! ওকি! ওইতো, একটা কালো বিন্দু দেখা যাচ্ছে না? পেটমোটা কনভেক্স গ্লাসের ঠিক কেন্দ্রে একটিমাত্র ফুটকি···দেখতে দেখতে তা পরিণত হল মাছিতে···মাছি থেকে ভীমরুল···এবং ভীমরুল থেকে গুবরে পোকায়। এবার স্পষ্ট দেখা গেল একটা ক্র্যাশ হেলমেট ঝুঁকে পড়েছে বাইকের হ্যাণ্ডেলবারের ওপর···দুটো মস্ত কালো থাবা আঁকড়ে রয়েছে হাতলদুটো।

সর্বনাশ! এযে দেখছি উল্কার মত ছুটে আসছে! দর্পণের বুক থেকে চকিতে বণ্ডের চোখ ঘুরে গেল সামনে বিস্তৃত পথের ওপর··· পরক্ষণেই ফিরে এল কনভেক্স গ্লাসের ওপর। খুনেটার ডান হাত রিভলবারটা তুলে নিলেই···

গতি কমিয়ে আনল জেমস বণ্ড—পঁয়ত্রিশ, তিরিশ, কুড়ি। মসৃণ ধাতুর মত ঝিকমিক করছে সামনের পিচ ঢালা পথ। আততায়ীর ডান হাতটা আর হ্যাণ্ডেলবার ধরে নেই। লৌহশিরস্ত্রাণের নীচে দুটো গগলসের কাঁচ সূর্যের আলোয় যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে দু-মালসা অঙ্গারের মত।

সময় হয়েছে। ভয়ানক জোরে ব্রেক কষলো বণ্ড এবং চক্ষের নিমেষে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণে রাস্তার ওপর পিছলিয়ে বোঁ করে ঘুরিয়ে নিয়ে গেল বি-এস-এ'কে। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হল ইঞ্জিন।

এমন আকস্মিক ক্ষিপ্রতা সত্বেও দেরী করে ফেলেছিল বণ্ড। উপর্যুপরি দুবার গর্জে উঠল হত্যাকারীর আগ্নেয়াস্ত্র। একটা বুলেট বণ্ডের উরুর পাশ দিয়ে গেঁথে গেল সিটের স্প্রিংয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কোল্ট রিভলবার। মাত্র একবার।

টলমল করে উঠল হত্যাকারীর মোটর বাইক। যেন একটা অদৃশ্য

দড়ির ফাঁস জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে হ্যাঁচকা টানে রাস্তার ওপর থেকে তুলে নিয়ে গেল বাইক সমেত খুনে চালককে। এলোমেলোভাবে সড়ক বেয়ে ছুটতে ছুটতে একলাফে টপকে গেল পাশের খানা এবং পরক্ষণেই প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ল একটা বীচগাছের গুঁড়ির ওপর। মুহূর্তের জন্যে গুঁড়ির গায়ে সেঁটে রইল বাইক সমেত চালক। তার পরেই ঝন্‌ঝন্ শব্দে গড়িয়ে পড়ল ঘাসের ওপর।

বাইক থেকে নেমে দাঁড়াল বণ্ড। ধীরপদে গিয়ে দাঁড়াল ধোঁয়া-ওঠা দোমড়ানো ইস্পাত আর বিকৃতভাবে মোচড়ানো দেহটার পাশে। নাড়ী দেখবার আর দরকার হল না। বুলেট যেখানেই লাগুক না কেন, ক্র্যাশ হেলমেটটা ডিমের খোলার মতই চূরমার হয়ে গেছে মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে।

ঘুরে দাঁড়াল বণ্ড। কোল্টটা আবার গুঁজে রাখল পেটের কাছে বেল্টের ফাঁকে। কপাল ভাল তার। আততায়ীর বুলেট আর একচুল এদিক দিয়ে গেলেই···

বি-এস-এ'র ওপর লাফিয়ে বসল বণ্ড, ফিরে চলল ক্যারিফোর রয়ালের দিকে।

জঙ্গলের মধ্যে আঁচড়কাটা একটা গাছের গুঁড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করালো বি-এস-এ'কে। তারপর গেল খোলা মাঠটার কিনারায়। মাথার ওপরে ঝাঁকড়া আখরোট গাছ। তাই জায়গাটা একটু ঝুপসি। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে যতদূর সম্ভব নকল করার চেষ্টা করল সেই বিচিত্র শিস-ধ্বনির। যেন খুশীমনে গান গেয়ে উঠল বনের পাখী। হত্যাকারীর চিচিং-ফাঁক সংকেত।

একবারই শিস দিল বণ্ড। তারপর দুরু-দুরু বুকে সুরু হল প্রতীক্ষা। তবে কি ভুল হল শিসের সুরে?

ঠিক তখুনি কেঁপে উঠল গোলাপঝাড়। আরম্ভ হল উচ্চগ্রামের তীক্ষ্ণ তীব্র গোঁ-গোঁ গজরানি। মোটর চলছে!

কোল্টের ইঞ্চিখানেকের মধ্যে বেল্টের ফাঁকে বুড়ো আঙুল আটকে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রইল বণ্ড। আর খুনখারাপি করার ইচ্ছে তার নেই। অনুচর দুজনকে সশস্ত্র বলে তো মনে হয় নি। কাজেই কি প্রয়োজন অযথা রক্তপাতের।

বেঁকানো দরজার পাল্লাদুটো দু-হাট হয়ে খুলে গেছে। ফাঁক দিয়ে প্রথমে বেরিয়ে এল একজন—তারপরে সেই অদ্ভুত দর্শন বিচিত্র চ্যাটালো জুতো। তারপরে আর একজন।

চ্যাটালো জুতো! ধড়াস করে উঠল বণ্ডের বুক। জুতোর কথাটা একদম মনেই ছিল না! নিশ্চয় ঝোপের মধ্যে কোথাও লুকানো আছে জুতোজোড়া। আহম্মক কোথাকার! দেখে ফেলল নাকি ওরা?

মন্থর চরণে হিসেব করে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে এল দুই পাতালবাসী—বিশ ফুট দূরে এসে কি যেন বলল সামনের লোকটা। রাশিয়ান ভাষা বলেই মনে হল। জবাব দিল না বণ্ড।

উত্তর না পেয়ে থমকে দাঁড়াল দুই মূর্তি, অবাক চোখে তাকিয়ে রইল বণ্ডের পানে—সম্ভবত সাংকেতিক প্রত্যুত্তরের আশায়।

বিপদ ঘনিয়ে আসছে। চক্ষের পলকে রিভলবারটা টেনে নিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেল বণ্ড, গর্জে উঠল ভয়ালকণ্ঠে—"হ্যাণ্ডস আপ!"

কোল্টের নলচে নেড়ে হাত ওপরে তোলার ইঙ্গিত করে বণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে পুরোধা ব্যক্তি জোর গলায় কি একটা হুকুম দিয়েই ছিটকে ধেয়ে এল সামনে। একই সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তিও ছুটে গেল পাতালপুরীর চিচিং-ফাঁক দরজার দিকে।

গাছের আড়াল থেকে দড়াম করে ধমক দিয়ে উঠল একটা রাইফেল এবং পা মুচড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পলায়মান লোকটা। এদিক সেদিক থেকে ছুটে আসছে 'এফ'-স্টেশনের চার জোয়ান।

সামনের লোকটা লাফ দিয়েছে বণ্ডকে লক্ষ্য করে। এক হাঁটুর ওপর বসে পড়ল বণ্ড, কোল্টের নলচে চালাল লোকটাকে লক্ষ্য করে।

গায়ে লাগল ঠিকই, কিন্তু তারপরেই যেন মাথার ওপর পাহাড় ভেঙে পড়ল। একই সঙ্গে দুজনে গড়িয়ে পড়ল ঘাসের ওপর। বণ্ডের চোখ লক্ষ্য করে চকিতে এগিয়ে এল আঙুলের নখ। চক্ষের পলকে পাশে সরে গেল বণ্ড এবং সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষম একটা আপারকাট ঘুসিতে ছিটকে পড়ল জমির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ভূলুণ্ঠিত দেহের ওপর লাফিয়ে পড়ল পাতালবাসী এবং ডানহাতের কব্জি মুচড়ে ধরে রিভলবারের নলচের মুখ আস্তে আস্তে প্রচণ্ড শক্তিতে ফিরিয়ে দিতে লাগল বণ্ডের দিকে।

আর খুন করার ইচ্ছে ছিল না বলেই সেফটি ক্যাচটা তুলে রেখেছিল বণ্ড। প্রাণপণ চেষ্টায় বুড়ো আঙুলটা সরিয়ে আনতে লাগল সেফটি ক্যাচের দিকে।

তৎক্ষণাৎ বুটের লাথি এসে পড়ল মাথার পাশে। মাথা ঘুরে গেল। অবশ হাত থেকে খসে পড়ল রিভলবারটা। লালচে কুয়াশার মধ্যে দেখল কোল্টের মৃত্যুমুখী নলচে অব্যর্থ নিশানায় স্থির হয়ে গেল তার খুলি টিপ করে।

মৃত্যু—এবার মৃত্যু! অনুকম্পা দেখিয়েছিল বণ্ড, তারই দাম দিতে হচ্ছে নিজের জীবন দিয়ে। কিন্তু একি!

আচম্বিতে উধাও হল কোল্টের কালো নলচে। দেহের ওপর থেকে সরে গেল লোকটার গুরুভার বপু। টলতে টলতে হাঁটুর ওপর উঠে বসল বণ্ড। তারপর দাঁড়াল সিধে হয়ে। পায়ের কাছেই চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে পাতালপুরীর সেই লোকটা। পিঠের কাছে গড়াচ্ছে রক্ত।

আশপাশে তাকাল বণ্ড। 'এফ'-স্টেশনের চার জোয়ান দাঁড়িয়ে দল বেঁধে। স্ট্র্যাপ খুলে ক্র্যাশ হেলমেটটা হাতে নিল বণ্ড। মাথার পাশে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—"সাবাস! কাজটা কার?"

কেউ জবাব দিল না। চারজনেই কেমন জানি বিমূঢ়।

বণ্ড নিজেও ঘাবড়ে গেল। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল। শুধোলো—"ব্যাপার কি ?"

হঠাৎ চোখে পড়ল দলবদ্ধ চার জোয়ানের পেছনে কি যেন একটা নড়ছে। দেখা গেল আর একটা বাড়তি পা। মেয়েলী পা!

অট্টহাস্য করে ওঠে বণ্ড। কাষ্ঠহাসি হেসে চার জোয়ান তাকায় পেছনে। বাদামী শার্ট আর কালো জীন পরে ওদের পেছন থেকে সামনে এগিয়ে এল মেরী অ্যান রাসেল—দুহাত শূন্যে তোলা। এক হাতে '২২ টার্গেট পিস্তল।

হাত নামিয়ে পিস্তলটা কোমরে গুঁজতে গুঁজতে বণ্ডের সামনে এল রাসেল। উদ্বিগ্ন স্বরে বললে—"দোষটা এদের নয়, আমার। আমিই ওদের পেছন ছাড়িনি।" চোখে মিনতি মাখিয়ে—"এসেছিলাম বলেই এ যাত্রা বেঁচে গেলেন। পাছে আপনার গায়ে গুলি লাগে, এই ভয়ে তো কেউ গুলিই করছিল না।"

চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসল বণ্ড—"না এলে হয়ত আজ রাতের খানাটাই বরবাদ হয়ে যেত ; তাই না ?"

বলেই ফিরল চার জোয়ানের দিকে। বলল কাঠখোট্টা গলায়—"অলরাইট। একজন মোটরসাইকেল নিয়ে চলে যান। কর্ণেল স্ক্রাইবারকে সংক্ষেপে রিপোর্টটা দিয়ে আসুন। বলবেন, ওঁরা না আসা পর্যন্ত আমি মাটির নীচে নামতে পারছি না। জনদুয়েক অ্যান্টি-স্যাবোটেজ এক্সপার্ট যেন আনেন। ফাঁদ পাতা থাকতে পারে দরজার মুখেই। ঠিক আছে ?"

সুন্দরীকে কাছে টেনে নিল বণ্ড। বলল—"আর আপনি আসুন আমার সঙ্গে। একটি পাখীর বাসার সন্ধান দেব।"

"সেটাও কি আপনার হুকুম ?"

"হ্যাঁ।"

২

রিসিকো মানে ঝুঁকি

"ইন দিজ পিজনিস ইজ মাচ রিসিকো।"

পুরু বাদামী গোঁফের তলা দিয়ে বেরিয়ে এল শব্দগুলো। কথাটা ইংরেজী। কিন্তু বিকৃত উচ্চারণের দরুণ অদ্ভুত শোনাচ্ছিল। বক্তা বলতে চাইছে, 'ইন দিজ বিজনেস ইজ মাচ রিস্ক'। অর্থাৎ এ কাজে ঝুঁকি অনেক। কিন্তু 'বিজনিসকে' 'পিজনিস' আর 'রিস্ক'কে 'রিসিকো' বলায় খটকা লাগা স্বাভাবিক।

বক্তার কুচকুচে কালো শক্ত চোখজোড়া এবার নিবদ্ধ হল বণ্ডের মুখ আর হাতের ওপর। বণ্ড তখন অতি সন্তর্পণে একটা কাগজের দেশলাই ছিঁড়ছে। দেশলাইয়ের ওপরে ছাপা "অ্যালবার্গো কলম্বা ডি'ওরো"।

কুচকুচে কালো চোখদুটো যে বণ্ডের চামড়া ছ্যাঁদা করে মন পর্য্যন্ত দেখছে, বণ্ড তা টের পেল। ঘণ্টাদুয়েক ধরেই চলছে এই নিরীক্ষণ পর্ব। এক্সেলসিওর পানাগারে আসার পর থেকেই। এসেছে ঐ গুঁফো মস্তানের সঙ্গেই আলাপ জমাতে। চুলচেরা দেখাও শুরু হয়েছে সেই থেকে।

বণ্ড শুনে এসেছিল যে লোকটার সঙ্গে তার মোলাকাৎ ঘটবে, নাকের নীচে তার ইয়া মোটা গোঁফ আছে। এক গেলাস 'আলেকজান্দ্রা' সুরা নিয়ে বসে থাকবে গোটা একটা টেবিল জুড়ে।

শুনে হাসি পেয়েছিল বণ্ডের। লোক চেনবার গোপন সংকেত এমন মেয়েলীও হয়। 'আলেকজান্দ্রা' মানেই ক্রীম মেশানো পানীয়। চোখে পড়বেই। গতানুগতিক চিহ্নের চাইতে ভাল। ভাঁজ করা খবরের কাগজ পড়া, বোতামের ঘরে ফুল গুঁজে রাখা বা হলদে দস্তানা পরে থাকার রেওয়াজ গুপ্তচরদের মধ্যে চালু আছে। এসব সংকেত দেখলেই একজন স্পাই আর একজন স্পাইকে চিনে নেয়। কিন্তু ক্রিস্ট্যাটোস বড় জবর চিহ্ন লাগিয়েছে। 'বারে' ঢুকে বণ্ড দেখেছিল জনাবিশেক লোককে। কিন্তু গোঁফ কারো নেই। এককোণে শুধু টেবিলে শোভা পাচ্ছে ক্রীম আর ভডকার তালঢ্যাঙা গেলাস। আর কোনোদিকে না তাকিয়ে বণ্ড গিয়ে বসেছিল টেবিলের সামনের চেয়ারে।

ওয়েটার এল—"গুড ইভনিং স্যার। সিনর ক্রিস্ট্যাটোস টেলিফোন করতে গেছেন।"

"গর্ডন দিয়ে এক গেলাস নিগ্রোনি আনো," বলেছিল বণ্ড।

বলতে বলতেই দৈত্যাকার ক্রিস্ট্যাটোস এসে পৌঁছেছিল। খেলনা চেয়ারের মত ছোট্ট চেয়ারটাকে তুলেছিল লোমশ হাতের বিশাল থাবা দিয়ে। ঝুলিয়ে রেখেছিল গুরুভার পাছার ঠিক নীচে। "দুঃখিত। অ্যালফ্রেডোর সঙ্গে কথা ছিল।"

করমর্দনের ধার দিয়েও যায়নি ক্রিস্ট্যাটোস। যেন অনেকদিনের চেনাজানা। সম্ভবতঃ একই কারবারের কারবারী। আমদানী রপ্তানী কারবারের মতই। আর কেউ কমবয়েসী পুরুষটাকে দেখলে মনে করত বুঝি আমেরিকান। উঁহু। তা তো নয়। পোশাক তো ইংরেজদের মত।

"ছোকরা আছে কি করম?" স্বাভাবিক গলা বণ্ডের।

ছোট হয়ে এসেছিল সিনর ক্রিস্ট্যাটোসের কুচকুচে চোখ। কথাটা তাহলে মিথ্যে নয়। লোকটা পেশাদারই বটে। মুখে বলেছিল—"একই রকম। আপনার কি মনে হয়?"

"পোলিও রোগটা খুব সাংঘাতিক তো।"

নিগ্রোনি এসে গিয়েছিল। জমিয়ে বসেছিল তুজনে। তুজনেরই মনে পরস্পরের প্রতি সমীহ। কম যায় না কেউই।

এই গেল মোলাকাতের প্রথম ধাক্কা। তারপরেও গেছে তু'তুটো ঘণ্টা। বণ্ডকে তখনো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করে চলেছে ক্রিস্ট্যাটোস। কম মজা নয় তো, মনে মনে ভেবেছে বণ্ড। বণ্ডকে গোপন কথা বলা যায় কিনা, বণ্ডের ওপর ভরসা রাখা যায় কিনা, এই নিয়ে যেন পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্ত নেই ক্রিস্ট্যাটোসের কথাবার্তায়। লোকটার এই অতিরিক্ত হুঁশিয়ারি একদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত করেছে বণ্ডকে। 'এম' ঠিক লোকই চিনেছেন। ক্রিস্ট্যাটোস অনেক খবর রাখে। নইলে বলত না 'ইন দিজ পিজনিস ইজ মাচ রিসিকো।'

ছেঁড়া দেশলাইয়ের শেষ ফালিটা ছাইদানীতে ফেলে বলল বণ্ড—"যে ব্যবসার লাভ শতকরা দশটাকার বেশী আর যে কাজ রাত নটার আগে সারা যায় না, শুনেছি তা নাকি সাংঘাতিক বিপজ্জনক ব্যাপার। যে কাজের কথা বলতে বসেছি, তাতে টাকা পাবেন শতকরা হাজার। গভীর রাত ছাড়া এ কাজ শেষ করার কথা ভাবাও যায় না। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, তুদিক দিয়েই ঝুঁকি প্রচুর এ কাজে।" বলেই গলা খাটো করল—"টাকার অভাব নেই এ বিজনেসে। ডলার, সুইস ফ্রাঁ, ভেনিজুয়েলান বলিভার—যা চাইবেন তাই পাবেন।"

"বাঁচলাম। আমার আবার ইটালিয়ান লীরা বড্ড বেশী জমে গেছে কিনা," মেনু তুলে নিয়ে বলল ক্রিস্ট্যাটোস। "এবার কিছু খাওয়া যাক। খালি পেটে ইমপরট্যাণ্ট পিজনিস নিয়ে কথা বলা যায় না।"

এই ঘটনার ঠিক এক সপ্তাহ আগে বণ্ডকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন 'এম'। বণ্ড গিয়ে দেখল ভদ্রলোকের মেজাজ সপ্তমে চড়ে রয়েছে।

খেঁকিয়ে উঠে শুধিয়েছিলেন "জিরো জিরো সেভেন, হাতে কাজ আছে ?"

"কাগুজে কাজ কিছু আছে।"

ধাঁ করে পাইপ নামিয়ে 'এম' বললেন—"কাগুজে কাজ মানে ? ও কাজ নেই কার ?"

"মানে তেমন গতর খাটানো কাজ কিচ্ছু নেই।"

"তাই বললেই তো হয়," লাল ফিতে বাঁধা একগাদা ফাইল নিয়ে এমন জোরে 'এম' টেবিলে ছুঁড়ে দিলেন যে লুফে নিতে হল বণ্ডকে। "নাও, কাগুজে কাজ আরো কিছু ধরো। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ব্যাপার —আফিংয়ের চোরাই কারবার। হোম অফিস আর মিনিস্ট্রী অভ হেলথ-এর কাগজপত্র জেনেভার আন্তর্জাতিক আফিং কনট্রোল-এর ইয়া মোটা রিপোর্ট। নিয়ে গিয়ে পড়ো। সারাদিন সারারাত ধরে পড়ো। কাল রোম যাবে। পালের গোদাদের পেছন নেবে। পরিষ্কার ?"

সায় দিল বণ্ড। 'এম'-এর তিরিক্ষে মেজাজের কারণটা এতক্ষণে বোঝা গেছে। আসল কাজ থেকে অন্য কাজে অধস্তন অফিসারদের টানলেই সাংঘাতিক মেজাজ খিঁচড়ে যায় ওঁর। আসল কাজ হল চরবৃত্তি, দরকার মত তছনছ করা, ধ্বংস করা, আগুন বোমা ইত্যাদি দিয়ে শত্রু ঘাঁটি লণ্ড ভণ্ড করা। এ ছাড়া কিছু করা মানেই সিক্রেট সার্ভিসের নামমাত্র তহবিলের অপচয়।

"জিজ্ঞাস্য কিছু আছে ?" জাহাজের গলুইয়ের মত ঠেলে বেরিয়ে এল 'এম'-এর চোয়াল। যার মানে অতি পরিষ্কার। বণ্ড যেন এখুনি ফাইল বগলে নিয়ে কেটে পড়ে। 'এম'-এর এর চাইতেও অনেক দরকারী কাজ আছে।

বণ্ড হাড়ে হাড়ে জানত এর সবটুকু আন্তরিক নয়—খানিকটা অভিনয়। 'এম'-এর মাথায় বেশ কয়েকটা পোকা আছে। মাঝে

মাঝে নড়ে ওঠে পোকাগুলো। সিক্রেট সার্ভিসে নামজাদা হয়ে গেছে প্রতিটি পোকা। 'এম'-এর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। বিদঘুটে পোকাদের রাণী পোকা হল সিক্রেট সার্ভিসের অপব্যবহার। বাদবাকী পোকা গুলো স্রেফ খাস-মেজাজি খেয়াল। যেমন, দাড়িওলা কাউকে চাকরী দেওয়া হবে না, পুরোপুরি দোভাষীদেরও স্থান নেই সার্ভিসে, ক্যাবিনেট মিনিস্টারদের সুপারিশ নিয়ে এলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া, ফতোবাবুর মত জামাকাপড় পরা পুরুষ বা নারীকে তুচক্ষেও দেখতে না পারা, ডিউটির সময় বাদে অন্য সময় 'স্যার' বলে আপ্যায়ন করলেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠা এবং স্কচ সাহেবদের মাথায় নিয়ে নাচা। চার্চিল বা মণ্টগোমারির মত নিজের খাস মেজাজ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন 'এম'। ওয়াকিবহাল থেকেও পাখী পড়ান না পড়িয়ে বণ্ডকে কোনো কাজে পাঠানো মোটেই পছন্দ করতেন না।

সবই জানত বণ্ড। জানত বলেই মিহি গলায় বলেছিল—"তুটো জিজ্ঞাস্য আছে, স্যার। এ কারবারে কেন নাক গলাচ্ছি? চোরা কারবারীদের খবরাখবর কি স্টেশন ওয়ানের কাছে পাওয়া যাবে?"

তেঁতো চোখে কটমট করে তাকালেন 'এম'। তারপর চেয়ার ঘুরিয়ে জানলা দিয়ে অক্টোবরের ছেঁড়া মেঘ দেখতে দেখতে বার কয়েক জম্পেশ টান দিলেন পাইপে। বিরক্তি বোধহয় ঈষৎ কমল। পাইপ নামিয়ে বললেন—"দেখো জিরো জিরো সেভেন, মাদক জিনিষের কারবারে সার্ভিস নাক গলাক, এ আমি চাই না। বছরের প্রথম দিকেই তোমায় মেক্সিকো পাঠিয়েছিলাম আফিং চাষীদের তাড়া দিতে। মরতে মরতে বেঁচে গেছলে সেবার। সেবার পাঠিয়েছিলাম স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের মুখ রাখতে, এবার ফের সেই অনুরোধ এসেছিল ইটালিয়ান গ্যাংটাকে শায়েস্তা করার জন্যে। সরাসরি না বলে দিয়ে-ছিলাম। তখন বোনি ভ্যালান্স আমাকে টপকে ধরাধরি শুরু করে

হোম অফিস আর মিনিস্ট্রি অভ হেলথ-এর দফতরে। চাপ এল মিনিস্টারদের কাছ থেকে। বলে পাঠালাম, তোমাকে এখন ছাড়া যাবে না। কারণ এখানে অনেক কাজ রয়েছে তোমার। তোমার বদলে কাউকে দেওয়াও যাবে না। তখন প্রাইম মিনিস্টারের কাছে ধর্ণা দিল দুজন মিনিস্টার।" একটু থেমে আবার বললেন 'এম'—"প্রাইম মিনিস্টার ছিনেজোঁকের মত বোঝালেন, ব্যাপারটা নাকি সোজা নয়। আফিং আর মরফিন থেকে তৈরী পাহাড় প্রমাণ 'হিরোইন' পাচার হচ্ছে দেশের মধ্যে। উদ্দেশ্য, সমাজের মনোজগতে বিপর্যয় আনা। এও একধরণের যুদ্ধ। মনস্তাত্ত্বিক লড়াই। দেশকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেওয়া। স্রেফ টাকা পেটা নাকি উদ্দেশ্য নয়। ইটালিয়ান গ্যাংয়ের পেছনে আরো কুচক্রী আছে।" তেঁতো হাসি হাসলেন 'এম', "যুক্তিটা খুব সম্ভব রোনি ভ্যালান্স-এর আবিষ্কার। আমেরিকার মত ইটালীতেও আফিংয়ের চোরাই চালান তরুণ সমাজকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে—সরকার হিমসিম খাচ্ছে। কিছুই করতে পারছে না। ভ্যালান্সের 'প্রেত ফৌজ' অবশ্য মাঝের লোকদের দু' একজনকে বার করেছে। মাল আসছে ইটালী থেকেই—টুরিস্টদের গাড়ী বোঝাই হয়ে। ইটালীয়ান পুলিশ আর আন্তর্জাতিক পুলিশকে নিয়ে সাধ্যমত করেছে ভ্যালান্স। দুচারটে ধড়পাকড় হয়েছে। কিন্তু জালের মাঝখানে পৌঁছোতে পারে নি।"

বাধা দিল বণ্ড—"নিশ্চয় কেউ বুক দিয়ে আগলাচ্ছে।"

"হতে পারে। প্রাইম মিনিস্টারের অর্ডার পাবার পর ওয়াশিংটনে কথা বলেছিলাম, সি.আই.এ. জানে অনেক কিছু। আফিং দফতরের একটা ঘাঁটি ইটালীতেও মোতায়েন আছে যুদ্ধের পর থেকেই। সি. আই.এ.-র সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আমেরিকান ট্রেজারী ডিপার্ট-মেণ্টের একটা শাখা আফিং-মরফিনের চোরাই চালান বন্ধ করার জন্যে সিক্রেট সার্ভিস ধাঁচের কিছু লোক পোষে। অদ্ভুত ব্যবস্থা। এফ-

বি-আই কেন যে মুখ বুজে সয়ে বায় বুঝি না।" বলে, ফের চেয়ার ঘুরালেন 'এম'—"সি. আই. এ-র চাঁই অ্যালান ডালেস একজনের নাম আমাকে দিয়েছে। লোকটার নাম ক্রিস্ট্যাটোস। দুমুখো সাপ। আসলে স্পাই। আফিং কারবারীদের খবরাখবর নিতে হলে আফিং চালানের ভাল করতে হয়। তাই একটু-আধটু সে কাজও করে। ডালেস খবর পাঠিয়েছে ক্রিস্ট্যাটোসকে। পরশুদিন তোমার সঙ্গে সে দেখা করবে রোমে। ডালেসের কাছে ও শুধু শুনেছে, গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে আমাদের এক মহা চৌকস লোক যাচ্ছে কথা বলতে। বাকীটুকু ঐ ফাইল পড়লেই পাবে।"

ঘর নিস্তব্ধ। বণ্ড ভাবছিল, গোটা ব্যাপারটাই যেন কেমনতর। বিপজ্জনক তো বটেই, সেই সাথে যাচ্ছেতাই রকমের নোংরা।

ফাইল বগলে উঠে দাঁড়ায় বণ্ড। শুধোয়—"টাকার খেলায় নামতে হবে মনে হচ্ছে। চালান বন্ধ করতে কত খরচ করবেন?"

ঝুঁকে পড়লেন 'এম'। রুক্ষ গলায় বললেন—"এক লাখ পাউণ্ড। যে কোন দেশের টাকায় ভাঙিয়ে দেব। প্রাইম মিনিস্টারের হিসেবে লাখ পাউণ্ড, আমার হিসেবে দরকার পড়লে আরও লাখ পাউণ্ড। কার্পণ্য করতে যেও না। মাদক জিনিসের কারবারে ঝুঁকি অনেক। অপরাধ মহলে এর চাইতে বিপজ্জনক আর জটিল চক্রান্তজাল আর নেই।"

মেন্যু তুলে নিয়ে বলল ক্রিস্ট্যাটোস—"মিস্টার বণ্ড, ফাঁকা কথায় আমার রুচি নেই, ছাড়বেন কত?"

"পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড। গ্যাংটার চিহ্ন যেন কোথাও না থাকে।"

উদাস কণ্ঠ ক্রিস্ট্যাটোসের—"তাতো বটেই। টাকা তো খোলাম কুচি নয়। ফুটি, শূয়োরের মাংস আর চকলেট আইস-ক্রীম আনাই। রাতে আমার কম খাওয়া অভ্যেস। কিয়ান্তিতেও অরুচি নেই।"

ওয়েটারকে বিদেয় করে খড়কে কাঠি চুষতে লাগল ক্রিস্ট্যাটোস। দেখতে দেখতে মুখ হল তোলা হাঁড়ির মত। যেমন গম্ভীর, তেমনি ক্রূর। চোখ ঘুরতে লাগল ঘরময়। চঞ্চল, অশান্ত চাহনি ঝলসে উঠতে লাগল থেকে থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে যেন মনস্থির করে ফেলল ক্রিস্ট্যাটোস। উঠে দাঁড়িয়ে বলল—"বাথরুমে যাচ্ছি," বলেই উধাও হল রেস্তোঁরার পেছন দিকে।

হঠাৎ বেজায় খিদে পেয়ে গেল বণ্ডের। সেইসঙ্গে গলা কাঠ হয়ে এল তেষ্টায়। কিয়ান্তি ঢেলে ভরল পেল্লায় গেলাস। আধ গেলাস খেয়ে রুটিতে হলদে মাখন মাখিয়ে ঠাসতে লাগল মুখে। ক্রিস্ট্যাটোসকে নিয়ে আর ভাবনা নেই। কাজের লোক। নইলে আমেরিকানরা অত ভরসা রাখে! নিশ্চয় ফোন করছে কাউকে। ফিরবে এখুনি। আচ্ছা, ফ্রান্স আর ইটালী ছাড়া পাকানো রুটি আর মাখন আর কোথাও এমন সুস্বাদু হয় না কেন?

চৌকোণা ঘরের অপর কোণে বসে ফুরফুরে চুলওলা চন্‌মনে মেয়েটা বলল সঙ্গের হাসিখুশী ভদ্রলোককে—"হাসিটা নিষ্ঠুর হলে কি হবে, চেহারায় তো ময়ূর ছাড়া কার্তিক। গুপ্তচররা তো এত সুন্দর হয় না। আপনার ভুল হয় নি তো?"

সুপুরুষ সঙ্গী তখন স্প্যাগেটি খেতে ব্যস্ত। মুখ থেকে প্লেট পর্যন্ত ঝুলছিল সেঁউইয়ের লম্বা সুতো। সঙ্গিনীর কথায় এক কামড়ে সুতো কেটে টম্যাটো সস মাখা ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঢেকুর তুলল সশব্দে। বলল—"এসব ব্যাপারে স্যানটোস বাজে খবর দেয় না। স্পাই দেখলেই ঠিক চেনে। এই গুণের জন্যেই তো ওকে বারোমাস বাস্টার্ড ক্রিস্ট্যাটোসের পেছনে লাগিয়ে রেখেছি। স্পাই ছাড়া শূয়োরটার সঙ্গে সন্ধ্যে কাটাতে কেউ চায়? তবুও সন্দেহের শেষ

রাখবো না।" বলে, পকেট থেকে টিনের যন্ত্র বার করে কটকট্ শব্দ করল। ঘরের অপর কোণ থেকে কাজ ফেলে রেখে দৌড়ে এল হোটেল ম্যানেজার।

"ইয়েস, স্যার।"

খাইয়ে লোকটা কেবল ঘাড় কাৎ করল। ইসারা বুঝল হোটেল ম্যানেজার। হেঁট হতেই কানে কানে হুকুম দিল উদর-প্রেমিক, সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরের কাছে "আফিসিও" লেখা দরজার সামনে গিয়ে ভেতরে উধাও হল ম্যানেজার।

এরপর যেন দাবাবোড়ের ঘুঁটি চালা শুরু হল। দাবার ছকের ওপর দিয়ে দানের ঘুঁটি যেমন ধাপে ধাপে নড়ে নড়ে এগোয় কিস্তিমাৎ ঘরের দিকে, ঠিক সেইভাবেই অনুষ্ঠিত হল একটা দৃশ্য। স্পাগেটি চিবুতে চিবুতে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সব দেখল পেটুক লোকটা।

"আফিসিও" লেখা দরজা দিয়ে ফের বেরিয়ে এল হোটেল ম্যানেজার। কড়া গলায় হুকুম দিল তুনম্বরকে—"চারজনের বাড়তি টেবিল।" তাড়াতাড়ি চোখে চোখে চাইল তুনম্বর। সায় দিল ঘাড় হেলিয়ে। ম্যানেজারের পেছন পেছন এসে দাঁড়াল বণ্ডের টেবিলের পাশে। তুড়ি মারতেই কয়েকজন এসে দাঁড়াল পাশে। এদিকে ওদিকে রাখা তুটো টেবিলের পাশ থেকে নিয়ে এল তুটো বাড়তি চেয়ার, তৃতীয় বাড়তি চেয়ারটা এল বণ্ডের টেবিলের পাশ থেকে (অবশ্য ক্ষমা চাওয়া হল এর জন্যে)। চতুর্থ চেয়ারটা এল 'আফিসিও' লেখা দরজার দিক থেকে—বয়ে নিয়ে এল হোটেল ম্যানেজার নিজেই। বাকী তিনটে চেয়ারের সঙ্গে চতুর্থ চেয়ারটি সাজিয়ে রাখবার পর মাঝখানে বসানো হল একটা টেবিল। কাঁচের টুকিটাকি বাসনপত্র সাজানো হল টেবিলে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল হোটেল ম্যানেজার। বলল—"সেকী! বললাম তিনজনের টেবিল পাততে, অথচ চেয়ার লাগিয়েছো চারটে!" কথা শেষ হওয়ার আগেই নিজেই

নিজের চেয়ারটা সরিয়ে রাখল বণ্ডের টেবিলের পাশে। হাত নাড়তেই টেবিল চেয়ার সাজাতে ছুটে এসেছিল যারা, তারা ছিটকে গেল যে-যার কাজে।

সব মিলিয়ে এক মিনিটও লাগল না। খুবই নিরীহ ব্যাপার। গোবেচারা তিনজন ইটালীয়ান ঢুকল রেস্তোঁরায়। ত্রিমূর্তিকে খাতির করে এনে নতুন পাতা টেবিলে বসিয়ে দিল হোটেল ম্যানেজার স্বয়ং।

বণ্ড দেখেও কিছু দেখল না। ক্রিস্ট্যাটোস কাজ গুছিয়ে ফিরে আসতেই খাবার এসে গেল।

খেতে খেতে বাজে কথার ঝুড়ি উপুড় করল দুই মূর্তি। ইলেকশন, আধুনিকতম আলফা রোমিও, ইটালীয়ান ও ইংলিশ জুতোর তুলনা —সব নিয়েই কথার ফোয়ারা ছোটালো। ক্রিস্ট্যাটোস নিজেই একটা কথার জাহাজ। কথা বলার কায়দায় ওস্তাদ, সব ব্যাপারের ভেতরে শাঁসটুকু জানে। খবর পরিবেশন করে কথার ফাঁকে ফাঁকে —ধাপ্পা বলে মনেই হয় না। আমেরিকানরা লোকটাকে নিয়ে কেন মেতেছে, বণ্ড তা উপলব্ধি করল, ক্রিস্ট্যাটোস কথার ধোকড় হলেও কাজের লোক।

কফি এল। কালচে রঙের সরু চুরুট ধরিয়ে কথার তুবড়ি অব্যাহত রাখল ক্রিস্ট্যাটোস। দাঁতের ফাঁকে নেচে নেচে উঠতে লাগল কালচে চুরুট। দুই হাত টেবিলের ওপর রেখে টেবিলের দিকে তাকিয়ে সহসা খাটো গলায় বললে—“এবার বিজনিস। আমি হাত মেলালাম। অ্যাদ্দিন আমেরিকানদের অনেক খবর দিয়েছি। যা কাউকে বলিনি, তা আপনাকে বলব। বলিনি, কেননা দরকার হয় নি। এরা আমেরিকায় কারবার করে না। যা কিছু কারবার ইংল্যাণ্ডে —আর কোথাও নয়। ইয়েস ?”

“বুঝলাম। সব কারবারেরই একটা এখতিয়ার থাকে তো।”

“ঠিক। খবর দেবার আগে সর্তটা জানানো দরকার। ইয়েস ?”

"তাতো বটেই।"

টেবিল ক্লথ নিরীক্ষণ যেন আরো বাড়ল। আরো ঝুঁকে পড়ে বললে সিনর ক্রিস্ট্যাটোস—"আমেরিকান ডলারে চাই দশ হাজার ডলার। কাল লাঞ্চ খাবার আগেই ছোট নোটে পুরো টাকা আনবেন। গ্যাংটাকে ধ্বংস করবেন আপনি। কাম ফতে হলে দেবেন আরো বিশ হাজার।" বণ্ডের মুখের ওপর দিয়ে পিছলে গেল ক্রিস্ট্যাটোসের চাহনি, "আমার লোভ নেই। যা দিতে চেয়েছিলেন, তার সবটা কিন্তু নিলাম না।"

"দাম তো ভালই।"

"দোসরা সর্ত। যদি মরেও যান, কোত্থেকে এত কথা জানলেন বলতে পারবেন না।"

"বেশ।"

"তেসরা সর্ত। গ্যাংয়ের চাঁই লোকটা অতি জঘন্য লোক," বলেই ফের চোখ তুলল ক্রিস্ট্যাটোস। কালো চোখে দেখা গেল লাল ঝিলিক। শুকনো শক্ত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে চুরুটের আশপাশ দিয়ে যেন তেড়ে বেরিয়ে এল কথাটা, "তাকে শেষ করতে হবে—খুন।"

সিধে হয়ে বসল বণ্ড। অদ্ভুত চোখে তাকাল ক্রিস্ট্যাটোসের পানে। এ যে জালের মধ্যে জাল! চক্রান্তের ফাঁকে চক্রান্ত! ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা নেওয়ার তোড়জোড়। ক্রিস্ট্যাটোসের দরকার একজন বন্দুকবাজকে। মজা হচ্ছে এই যে ক্রিস্টাটোস ভাড়া করছে না বন্দুকবাজকে, বন্দুকবাজই ভাড়া গুনছে ক্রিস্ট্যাটোসকে তারই পুরোনো শত্রুকে নিপাত করার জন্যে। মজা মন্দ নয় তো! সিক্রেট সার্ভিসের টাকায় ক্রিস্ট্যাটোসের শত্রু নিধন!

"কিন্তু কেন?" মোলায়েম প্রশ্ন বণ্ডের।

"প্রশ্ন করবেন না। মিথ্যে বলতে চাই না।" উদাসীন কণ্ঠ ক্রিস্ট্যাটোসের।

কফিতে শেষ চুমুক দিল বণ্ড। দলগত অপরাধের পুরোনো কেচ্ছা নিশ্চয়। হিমবাহের মত। শুধু ডগাটুকু দেখা যায়— তলায় চোখের আড়ালে বিস্তার অনেক। কিন্তু তা নিয়ে দরকার কি বণ্ডের ? ওর কাজ বিশেষ ধরনের। সে কাজ সারতে গিয়ে কারো উপকার হয় তো হোক, ক্ষতি কি ? 'এম' মোটেই ব্যাজার হবেন না এতে। বণ্ডের ওপর হুকুম আছে আফিং চালানোর গোটা গ্যাংটাকে ধ্বংস করার। নামহীন এই লোকটাই যদি গ্যাংলীডার হয়, তাকে ধ্বংস করতেই হবে। হুকুম তাই। মুখে বলল—"কথা দিতে পারছি না। সে ভাবনা আপনার। কেউ যদি আমাকে মারতে আসে, আমি তাকে মারব। প্রাণে মারব। নইলে নয়।"

একটা টুথপিক টেনে নিয়ে আঙুলের নখ সাফ করতে লাগল ক্রিস্ট্যাটোস। এক হাতের পাঁচটা আঙুল পরিষ্কার হবার পর চোখ তুলে বলল—"কথা না পেলে কাজ আমি করি না। তবে এ ক্ষেত্রে করব। কারণ, টাকা ঢালছেন আপনি—আমি নয়। আপনি দিচ্ছেন, আমি নিচ্ছি। বেশ, তাহলে খবর শুনুন। শোনবার পর আপনি কিন্তু একা হয়ে যাবেন। আমি আর নেই। কালই আমি করাচী যাচ্ছি। ইমপরট্যাণ্ট পিজনিস। খবর দিয়েই আমি খালাস। কাজ সারবেন একা।"

"রাজী।"

চেয়ারটাকে বণ্ডের চেয়ারের কাছে সরিয়ে আনল সিনর্ ক্রিস্ট্যাটোস। মিহি গলায় তুরন্তগতিতে শুরু হল খবর দেওয়া। খবরটা যে ছাঁকা, তার প্রমাণস্বরূপ তারিখ, নাম বলতে দ্বিধা করল না। বাজে বিষয় নিয়ে মোটেই সময় নষ্ট করল না। কাহিনী অতি ছোট। সার কথা হল এই। যুক্তরাষ্ট্র থেকে খেদিয়ে দেওয়া দুহাজার বদমাস লুঠেরা ডেরা নিয়েছে এ দেশে। পুলিশের মার্কামারা দাগাবাজ লিস্টে নাম উঠেছে প্রত্যেকের। কুকীর্তি এদের এত জঘন্য

যে ওদের দেশোয়ালী ভাইরাও চাকরী দিতে চায় না। এদের মধ্যে চাঁই বলতে একশজন। সাংঘাতিক তুঁদে এই একশজন টাকা জোগাড় করে সটকেছে বেরুট, ইস্তানবুল, ট্যানজিয়ার আর ম্যাকাওতে। চারটে জায়গাই বিশ্বের বৃহত্তম স্মাগলিং কেন্দ্র। দাগাবাজদের আর একটা বড় দল মাল লেনদেন নিয়ে ব্যস্ত। এদের মধ্যে যারা মহাপ্রভু, তারা বেনামীতে মিলানে ওষুধের কারখানার মালিক হয়ে বসেছে। এই হল একটা ঘাঁটি। বাইরের দল আফিং, মরফিন, হিরোইনের চোরাই চালান দিচ্ছে এই কারখানায়। ছোট ছোট জাহাজে ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে, একদল স্টুয়ার্ডের যোগসাজসে ইটালীয়ান উড়োজাহাজে, হপ্তায় হপ্তায় 'ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস' রেলপথে আসছে চোরাই চালান। ইস্তানবুলের ট্রেন ক্লীনারদের টাকা খাইয়ে 'ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেসের' যাবতীয় চামড়ার গদির নীচে লুকোনো হয় আফিং। মিলানের ওষুধ কোম্পানীর নাম 'ফার্মোসিয়া কলম্বা এস-এ'। এ কারখানার মূল কাজ হল মাল পাচার করা আর কাঁচা আফিং থেকে হিরোইন বানানো। বিভিন্ন কোম্পানীর তৈরী হরেক রকম নিরীহ দর্শন মোটরগাড়ীতে এই মাল ডেলিভারী হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের দালালদের কাছে।

এই পর্যন্ত শুনে বণ্ড বলে উঠল,—"আমাদের কাস্টমস কিন্তু ঘুমোয় না। এ ধরনের চোরাই চালান ধরা ওদের কাছে ছেলেখেলা। মোটরে লুকোনোর জায়গাও তেমন নেই। মালটা থাকে কোথায়?"

"বাড়তি চাকার মধ্যে। এক-একটা বাড়তি চাকার মধ্যে বিশ হাজার পাউণ্ড দামের 'হিরোইন' বওয়া যায়।"

"ধরা পড়ে না? মিলানের ভেতরে আনার সময়ে, ভেতর থেকে বাইরে নেওয়ার সময়ে কেউ দেখে না?"

"দেখে তো বটেই। ধরাও পড়ে। কিন্তু পোড় খাওয়া লোক তো। থানা পুলিশের হ্যাঁপা পোহাতে অভ্যস্ত। ধরা পড়লেও মুখ

খোলে না। জেল হলে প্রতিবছর জেলে থাকার দরুণ পায় বছর পিছু দশহাজার ডলার। বউ বাচ্চা থাকলে তাদের খোরপোশের ভার পালের গোদার। এ ছাড়াও কাম ফতে হলে মোটা টাকা তো আছেই। কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা। লাভের ভাগ পাবে সকলেই। পালের গোদা পাবে সিংহের বখরা।"

"বেশ। পালের গোদাটি কে?"

"সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে তার নাম 'দি ডাভ'। আসল নাম, এনরিকো কলম্বো। এই রেস্তোরাঁর মালিক। এখানে আপনাকে এনেছি সেই কারণেই—চিনিয়ে দেওয়ার জন্যে। কোণের টেবিলটা দেখুন। ফুরফুরে চুলওলা মেয়েটার পাশে মোটা লোকটার নাম এনরিকো কলম্বো। মেয়েটা অবশ্য ভিয়েনার বেশ্যা। নাম, লিল বম।"

"বটে! বটে!" বলল বণ্ড, কিন্তু তাকালো না। তাকানোর দরকার হল না। টেবিলে বসবার আগেই তাকানো হয়ে গিয়েছিল সেদিকে। রেস্তোরাঁর কারোরই বাকী নেই তাকানোর। মেয়েটার চোখে খুশী উপচোনো নির্ভীক চাহনি। সব ভিয়েনা-সুন্দরীর চোখেই এ চাহনি থাকা উচিত, কিন্তু থাকে কদাচিৎ। তনুশ্রী ঘিরে এমন একটা সজীবতা, প্রাণোচ্ছলতা, মিষ্টতা, যে ঘরের কোণ যেন আলো হয়ে গিয়েছে তার একার রূপে। যেমন চুল, তেমনি চোখ। হাসি হাসি মুখ। কণ্ঠ ঘিরে কালো ফিতে। জেমস বণ্ড টেবিলে বসার পর থেকেই আড়চোখে দেখেছে, বারংবার তার দিকে তাকাচ্ছে সুন্দরী। সঙ্গী ভদ্রলোকের কাপ্তেন চেহারা। মেয়েরা বর্তে যায় এমনি কাপ্তেন পাকড়ালে। খুশী উজ্জ্বল, পকেট ভারী। দিন কয়েক দিব্বি ফুর্তি লোটা যায়। নাঃ, লিল বমের রুচি আছে।

চকিতে দেখে নিল বণ্ড। কি নিয়ে খুব হাসাহাসি চলছে দুজনের মধ্যে। রূপসী-গালে ঠোনা মারল টাকাওলা কাপ্তেন-সঙ্গী, উঠে

দাঁড়ালো, হন হন করে গিয়ে 'আফিসিও' লেখা দরজা ঠেলে উধাও হল ভেতরে।

বটে! এই শর্মাই আফিং চোরাই চালানের কর্ণধার! এরই মাথার জন্যে লাখ পাউণ্ড দর হেঁকেছেন 'এম'। একেই সংহার করতে চাইছে ক্রিস্ট্যাটোস বণ্ডকে দিয়ে।

খামোকা দেরী করে লাভ কি? নামা যাক কাজে। রূঢ়ভাবে মেয়েটির দিকে তাকালো বণ্ড। মেয়েটিও তাকালো। বণ্ড হাসল। মেয়েটি যেন দেখেও দেখল না। শুধু মিষ্টি হাসল। তারপর সিগারেট টেনে নিয়ে ঠোঁটে বুলিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল কড়িকাঠের দিকে। গলা আর সারা মুখ এগিয়ে ধরল সামনে, যেন কারও প্রত্যাশায়। এ ইসারার মানে জানে বণ্ড। মেয়েটি 'অফার' করছে। বণ্ডের বাহুর মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিতে চাইছে।

সিনেমা ভাঙার সময় এসেছে। এখুনি ভীড় বাড়বে রেস্তোরাঁয়। খালি টেবিল সাফ করা আর নতুন টেবিল পাতা আরম্ভ হয়েছে। তদারক করছে হোটেল ম্যানেজার। ছুরীকাঁটার ঝনঝন শব্দের সঙ্গে মিশেছে গেলাসের টুংটাং আওয়াজ আর ন্যাপকিনের খসখসানি। বণ্ডের আনমনা চোখের ওপর দিয়েই পাশের বাড়তি চেয়ারটা সরে গেল পাশের টেবিলে। ছজনের জায়গা হবে সেখানে।

এনরিকো কলম্বোর রোজকার অভ্যেস নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল বণ্ড। কোথায় থাকে? মিলানের ওষুধ কারখানার ঠিকানা কি? আরও ব্যবসা আছে নাকি? কথায় কথায় খেয়ালই রইল না, বাড়তি চেয়ারটা এ টেবিল সে টেবিল ঘুরতে ঘুরতে উধাও হল 'আফিসিও' লেখা দরজার ভেতরে।

চেয়ার এসে পৌঁছোলো অফিসের মধ্যে। হোটেল ম্যানেজারকে বিদেয় করে ভেতর থেকে দরজায় চাবী দিল এনরিকো কলম্বো। এল

চেয়ারের সামনে। বেজায় পুরু গদীটা তুলে রাখল টেবিলে। গদীর পেছনে জিপ চেন ধরে টান দিতেই পেট ফাঁক হয়ে গেল কুশনের। টান দিতেই বেরিয়ে এল একটা গ্রুনডিগ টেপরেকর্ডার। মেশিন তখনও চলছে। সুইচ বন্ধ করে টেপ চালালো পেছন দিকে। রেকর্ডার থেকে টেপ খুলল, বসালো প্লেব্যাকের ওপর। স্পীড আর ভল্যুম ঠিকঠাক করে এসে বসল চেয়ারে, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে কান পেতে শুনতে লাগল কথোপকথন। মাঝে এটা-ওটা টিপে টেপ পেছনে ঘুরিয়ে বিশেষ কয়েকটি কথা বারবার শুনল। সবশেষে শোনা গেল বণ্ডের চিঁ-চিঁ কণ্ঠ—"বটে! বটে!"

তারপর আর শব্দ নেই। নীরবতা অনেকক্ষণ। কেবল রেস্তোরাঁর ব্যাকগ্রাউণ্ড শব্দ-লহরী। আর কোনো কথা নেই। সুইচ বন্ধ করল এনরিকো কলম্বো। মূক মেশিনটার দিকে চেয়ে রইল পুরো এক মিনিট। নিবিড় তন্ময়তা ছাড়া চোখে মুখে আর কোনো ভাবনার মেঘ নেই। ধীরে ধীরে মেশিনের ওপর থেকে দৃষ্টি ঘুরল অন্যদিকে—শূন্য চাহনি। মৃদু কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে বলল আপন মনে—"বেশ্যার বাচ্ছা!" উঠে দাঁড়ালো আরও ধীরে। দরজার কাছে গিয়ে খুলল তালা। ফের তাকাল গ্রুনডিগ মেশিনের দিকে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল আরেকবার—"বেশ্যার বাচ্ছা!" বলে, দরজা খুলে গেল বাইরে। বসল কোণের সেই টেবিলে।

দ্রুত, চাপা, জরুরী কণ্ঠে মেয়েটিকে কি যেন বলল এনরিকো কলম্বো। ঘাড় নেড়ে সায় দিল রূপসী, তাকালো ঘরের অপর প্রান্তে বণ্ডের পানে। বণ্ড আর ক্রিস্ট্যাটোস তখন টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

যেন অকস্মাৎ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল ভিয়েনা সুন্দরী। রুষ্ট রুক্ষ গলায় বললে কলম্বোকে—"জঘন্য লোক বটে আপনি। আপনার অনেক কুকীর্তি আমি শুনেছি। কাছে আসতেও বারণ করেছে

কতজন। হাড়ে হাড়ে এখন বুঝছি হক কথাই বলেছে সবাই। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! থার্ডক্লাস রেস্তোরাঁয় ভারী তো ডিনার খাইয়েছেন, মাথা কিনে নিয়েছেন নাকি? মুখে যা আসে তাই বলছেন! যা নয় তাই চাইছেন!"

ধাপে ধাপে উচ্চগ্রামে উঠল রূপসী-কণ্ঠ। বলতে বলতে টান মেরে হ্যাণ্ডব্যাগ হাতে নিয়ে ছিটকে গেল চেয়ার ছেড়ে। যে-পথ দিয়ে বণ্ড বাইরে যাবে, ঠিক তার পাশের একটা টেবিল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ফুঁসতে লাগল বন্‌বেড়ালের মত।

রাগে কালচে হয়ে গিয়েছিল এনরিকো কলম্বোর মুখ। ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ফেটে পড়ল অ্যাটম বোমার মত—"তবে রে অস্ট্রিয়ান বেশ্যা—"

"খবরদার ইটালীয়ান ব্যাঙ, দেশ তুলে কথা বলবেন না।" বলেই অর্ধেক ভর্তি মদের গেলাস তুলে এমন তাগ করে ঝাঁকুনি মারল যে গেলাস রইল হাতে, কিন্তু গেলাসের সব মদটা গিয়ে পড়ল এনরিকোর মুখে। তেড়ে এল কলম্বো। মেয়েটা টুক করে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল বণ্ডের পথ জুড়ে। ক্রিস্ট্যাটোসকে নিয়ে বণ্ড এসেছিল বেরোনোর পথে—বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়াল বিনীত মুখে।

ন্যাপকিন দিয়ে মুখের মদ মুছতে মুছতে রাগে ফুলতে লাগল কলম্বো। গর্জে উঠল ভয়ানক কণ্ঠে—"বেরোও, বেরোও! আর যেন কোনোদিন মুখ না দেখি।" বলেই থু-থু করে মেয়েটির সামনের মেঝেতে থুথু ফেলে হন হন করে উধাও হল 'আফিসিও' লেখা কামরার ভেতরে।

হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এল হোটেল ম্যানেজার। সবারই খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে চেঁচামেচিতে। বণ্ড অতি সহজ ভঙ্গিমায় মেয়েটির কনুই ধরে বললে—"আসুন, ট্যাক্সি ডেকে দেব?"

এক ঝটকায় কনুই ছাড়িয়ে নিল রূপসী। খেঁকিয়ে উঠল রাগত

গলায়—"শূওর ! শূওর ! সব পুরুষই শূওর !" বলেই, বুঝল অসভ্যতা হয়ে যাচ্ছে। বলল আড়ষ্ট ভঙ্গিমায়—"অশেষ দয়া আপনার।" বলতে বলতেই এগোলো বাইরের দরজার দিকে।

গুঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ছুরীকাঁটার ঠন ঠনাঠন শব্দ আবার শুরু হল রেস্তোরাঁয়। কৌতুকের হাসি সবার চোখেই। তাই মুখরোচক আলোচনা টেবিলে টেবিলে। হোটেল ম্যানেজার বিনয়াবনত ভঙ্গিমায় খুলে ধরল দরজা। বণ্ডকে বলল—"মঁসিয়ে, মাপ চেয়ে রাখছি। আপনি থাকায় জিনিসটা মিটে গেল সহজেই।" ট্যাক্সি ব্রেক কষল সামনে। দরজা খুলে ধরতেই মেয়েটি আগে উঠল, পেছনে বণ্ড।

জানলা দিয়ে ক্রিস্ট্যাটোসকে বলল বণ্ড—"কাল সকালে ফোন করব।" বলেই ফিরল রূপসীর দিকে—"হোটেল অ্যামবাসাডার।"

চলল ট্যাক্সি। কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা নেই। তারপর বণ্ড বলল—"কোথাও গিয়ে একটু ড্রিঙ্ক করলে হত না ?"

"নো, থ্যাংকিউ ! আজ আর শরীর মন বইছে না।"

"অন্য কোনো রাতে ?"

"কিন্তু কালকেই যে ভেনিস যাচ্ছি।"

"আমিও তো যাচ্ছি। কাল রাতে একসঙ্গে খেলে হয় না ?"

হেসে ফেলল মেয়েটি—"ইংলিশম্যানরা তো জানতাম লজ্জায় নেটিপেটি হয়। আপনিও তো ইংলিশ, তাই না ? নাম কি ? কি করেন ?"

"ইংলিশ তো বটেই। নাম, বণ্ড—জেমস বণ্ড। বই লিখি—অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। এখন লিখছি মাদক জিনিসের চোরাই চালান নিয়ে। কাহিনীর অকুস্থল হল রোম আর ভেনিস। কিন্তু মহা মুস্কিলে পড়েছি। আফিং চোরাই চালানের বিন্দু বিসর্গ জানিনা আমি। তাই এখানে ওখানে ঘুরে খবর জড়ো করছি। আপনি জানেন নাকি ?"

"তাই বুঝি ক্রিস্ট্যটোসের সঙ্গে ডিনার গিলছিলেন ? হাড়ে হাড়ে চিনি ওকে। বজ্জাতের শিরোমণি। না, মশাই, না। গল্প-টল্প আমি জানি না। সবাই যা জানে, আমিও তাই জানি।"

বণ্ডের গলায় যেন উৎসাহ উপচে পড়ল—"আমিও তো তাই চাই। গল্প মানে তো গাল গল্প নয়, বুজরুকি নয়। যা সত্যি, যা ঘটছে, তো পেলেই বর্তে যাবো। কানাঘুষো তো চলে। তারই দাম তো হীরের সমান—অন্তত আমার মত লেখকের কাছে।"

হেসে ফেলল রূপসী—"হীরের সমান ?"

বণ্ড বলল—"অত রোজগার না করলেও মন্দ রোজগার নয় আমার। ফিল্মে এ জাতীয় কাহিনী আনার অগ্রিম স্বরূপ কিছু টাকা পেয়েছি। এখন যদি গল্পটাকে খাঁটি রূপ দিতে পারি, তাহলেই মোটা দাঁও পেটা যাবে।" রূপসীর কোলে হাত রাখল বণ্ড। হাত ঠেলে ফেলার কোনো চেষ্টা দেখা গেল না। "হীরের দাম দিতে পারি যদি গল্পটা ফিল্ম কোম্পানী কিনে নেয়। ভ্যানক্লিফের হীরের ক্লিপ দেব। রাজী ?"

এবার হাত সরিয়ে দিল রূপসী। হোটেল অ্যামবাসাডার এসে গেছে। ট্যাক্সির দরজা খুলেছে। রাস্তার আলোয় নক্ষত্রের মত জ্বলছে সুন্দরী-নয়ন। সিরিয়াস চাহনি। বণ্ডকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল নক্ষত্র চক্ষু। তারপর—"পুরুষ মানেই শূওর। দুচারটে পুরুষ অবশ্য কমমাত্রায় শূওর। অলরাইট। দেখা আমাদের হবে। তবে ডিনার টেবিলে নয়। যা বলব, তা খোলা জায়গায় বলা যায় না। রোজ বিকেলে লিডোতে নাইতে যাই। জায়গাটার নাম বাগনি আল-বেরোনি। ইংলিশ কবি বায়রণ ঘোড়া চড়তেন যেখানে। উপদ্বীপের ছুঁচোলো প্রান্তে। পরশু বেলা তিনটে নাগাদ পাবেন আমাকে। রোদ পোহাব। বালির পাহাড়ের মধ্যে। ফিকে হলদে ছাতার

নীচে। টোকা না মেরে উঁকি দেবেন না। নাম ধরে ডাকবেন। মিস লিল বম আমার নাম।”

বলেই ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল রূপসী। বণ্ডও নামল। হাত নেড়ে গুডনাইট জানিয়ে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল লিল বম। পেছন থেকে ঢলঢলে দেহরেখার দিকে চিন্তাকুটিল চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল বণ্ড। তারপর ফিরে এসে ট্যাক্সিকে বলল হোটেল ন্যাজিওনেলে যেতে।

রেলপথে রোম থেকে ভেনিস যেতে হলে ল্যাগুনা এক্সপ্রেসে যাওয়াই ভাল। আরাম বেশী। ছাড়ে রোজ দুপুরে। লণ্ডন হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে কাজের কথা সেরে কোনোমতে ছুটন্ত ট্রেনে উঠে বসল বণ্ড। পেছনের কামরা। অ্যালুমিনিয়াম কোচ।

যথাসময়ে এল শহরের রাণী ভেনিস। গ্র্যাণ্ড ক্যানালের রক্তরাঙা সূর্যাস্ত সব অবসাদ যেন ধুইয়ে মুছিয়ে দিল। যে-টুকু অবশিষ্ট ছিল, তাও গেল সেরা হোটেলে একটানা আটঘণ্টা ঘুমোনোর পর।

ভেনিসে আসার সেরা মাস হল মে আর অক্টোবর। রোদ তখন মিষ্টি, রাতেও আমেজী ঠাণ্ডা। রোদে পাথর তেতে ওঠে না। মাইলের পর মাইল হাঁটা যায়। টুরিস্টের ভীড়ও তুঙ্গে পৌঁছায় না। ভীড় বাড়লেও ভেনিস কাতর নয়। হাজার হাজার টুরিস্টকে একসঙ্গে জায়গা দেবার ক্ষমতা বোধ করি সারা বিশ্বে একমাত্র ভেনিস শহরেরই আছে।

পরের দিন সারা সকালটা শহরের পথে-ঘাটে টোঁ টোঁ করল বণ্ড। কয়েকটা গির্জেতেও গেল। সদর দরজা দিয়ে ঢুকে উধাও হল পাশের দরজা দিয়ে। চোখ রইল পেছনে। মতলব তো শহর দেখা নয়, পেছনে ফেউ লাগলে তাকে দেখা। কিন্তু কেউ নেই।

নিশ্চিন্ত হয়ে সকাল সকাল লাঞ্চ খেয়ে নিল বণ্ড। হোটেলে ফিরে

ঘরবন্ধ করে কোট খুলল। বার করল অটোমেটিক। ওয়ালথার পি-পি কে। সেফটি ক্যাচ লাগিয়ে প্র্যাকটিস করল বার কয়েক। খাপ থেকে কত তাড়াতাড়ি রিভলবার টেনে বার করা যায়, সে মহড়াও হল। বার দুয়েকেই খুশী হল বণ্ড। রিভলবার ফিরে গেল চামড়ার হোলস্টারে। নীচে এসে স্পীডবোটে চেপে রওনা হল অ্যালবেরোনি অভিমুখে। কাঁচের মত হ্রদের জলপৃষ্ঠ তোলপাড় হল জলযানের গতিবেগে।

লিডো উপদ্বীপের যেদিকে ভেনিস, সেদিকের অ্যালবেরোনি জেটি থেকে আধমাইলটাক ধূলিধূসর পথ। উপদ্বীপের ছুঁচালো প্রান্তে এ যেন অন্য এক জগৎ। পরিত্যক্ত। মরুভূমির মত খাঁ-খাঁ করছে সব কিছু। কলোনী পত্তনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ঘর দোর যেমন তেমনি পড়ে। জেলেদের গাঁ। ছাত্রদের স্বাস্থ্যনিবাস। ইটালীয়ান নেভীর কামান রাখার স্তূপ। এখন অবশ্য ঝোপে ঢাকা। গত যুদ্ধের নিদর্শন। প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। এরই মাঝে গলফ খেলার জন্যে খানিকটা জায়গা ঘিরে রাখা হয়েছে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে। মাইন পোঁতা অঞ্চল। মাইন সরানোর সময় কারো হয় নি। তাই মড়ার খুলি আর আড়াআড়ি হাড় আঁকা তক্তায় লেখা—"সাবধান। মাইন পোঁতা আছে।" সারা অঞ্চল বিষাদের ছায়ায় থমথমে। অথচ দূরত্ব বেশী নয়। হ্রদ পেরিয়ে ভেনিস থেকে ঘণ্টাখানেকের কম সময় লাগে এ তল্লাটে আসতে।

আধমাইল হাঁটতেই ঘেমে উঠেছিল বণ্ড। বাবলার ছায়ায় একটু জিরিয়ে নিল। সামনেই কাঠের জীর্ণ খিলেন। নীল রঙে লেখা—বাগনি অ্যালবেরোনি। ওদিকে কয়েকটা ভাঙাচোরা কাঠের ঘর, শ'খানেক গজ পর্যন্ত বালুকাবেলা, নীল কাঁচের মত টলমলে সমুদ্র। স্নানার্থী একজনও নেই। কেউ আসে বলেও মনে হয় না। অথচ

খিলেন পেরোতেই রেডিওতে ক্ষীণ বাজনা শোনা গেল। শব্দটা আসছে ভাঙাচোরা কাঠের ঘরগুলোর ভেতর থেকে।

সমুদ্রের ধার বরাবর হাঁটতে লাগল বণ্ড। বাঁদিকে সাগর বেলা ঈষৎ বেঁকে গেছে লিডোর লোকালয় পর্যন্ত। ডানদিকে আধ মাইল গেলেই সমুদ্র প্রাচীর শীর্ষে মাঝে মাঝে অক্টোপাস জেলেদের মাচা। সাগরবেলার পেছনে বালির টিলা। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা গলফ মাঠের কিছু অংশ। বালির পাহাড়ের কিনারায় প্রায় পাঁচশ গজ দূরে জ্বলজ্বল করছে একটুকরো উজ্জ্বল হলুদ রঙ।

সেইদিকেই পা চালালো বণ্ড।

"কে ওখানে?"

বিকিনির ঊর্দ্ধাংশ নিমেষে ওপরে টেনে তুলল পেলব দুটি হাত। সামনে এসে দাঁড়াল বণ্ড। ছাতার ঝলমলে ছায়ায় ঢাকা পড়েছে কেবল মুখটি। শরীরের বাকী অংশ রোদে মেলা—সূর্য-জ্বলা ঘি রঙ ঢাকা সাদা-কালো তোয়ালে আর কালো বিকিনি দিয়ে।

আধবোঁজা চোখ মেলে তাকায় লিল বম—"এসেছেন পাঁচমিনিট আগে। পই-পই করে বলা সত্ত্বেও টোকা মারেন নি।"

ছাতার ছায়ায় বসে পড়ল বণ্ড। বসল সুন্দরীর গা ঘেঁসে। রুমাল বার করে মুখ মুছে বলল—"মরুভূমির মাঝে তালগাছ বলতে তো দেখছি এই ছাতা। ঝটপট ছায়ায় বসতে কার না ইচ্ছে যায়। দেখাসাক্ষাতের এই কি জায়গা?"

হাসল সুন্দরী—"স্বভাবে আমি গ্রেটা গার্বো। একলা থাকতে চাই।"

"সত্যিই কি একলা?"

"না তো কি? বডিগার্ড এনেছি বলে মনে হয়?"

"আপনার মতে পুরুষ মানেই তো শূওর—"

"কিন্তু আপনি হলেন ভদ্রলোক শূওর।" খুক খুক করে হাসল

সুন্দরী। "বনেদী শূওর। তাছাড়া, এ জায়গায় ও সব চলেও না। যা বালি। সব চাইতে বড় কথা, আমরা এসেছি ব্যবসার কথা বলতে। আপনাকে আফিং চোরাই চালানের গল্প শোনাবো। দাম দেবেন হীরের ক্লিপ কিনে দিয়ে। তাইতো? নাকি মত পালটেছেন?"

"না, পালটাইনি। শুরু করলেই হয় এবার।"

"প্রশ্ন করুন, আমি জবাব দিচ্ছি। বলুন কি জানতে চান," উঠে বসল সুন্দরী। দুইচোখের রঙ্গ উধাও হয়েছে, সিরিয়াস চাহনি এখন বেশ হুঁশিয়ার।

পরিবর্তনটা নজরে এল বণ্ডের। সাদা গলায় বললে—"শুনলাম আপনার বন্ধু কলম্বো নাকি এ কারবারে বড় কারবারী। তার কথাই আগে বলুন। গল্পে ও চরিত্র জমবে ভাল। নাম পালটে দেব, ভয় নেই। খুঁটিয়ে বলুন। কারবার চালায় কিভাবে? লেখকরা যা কল্পনায় আনতে পারে না, তা বলে যান, আমি কাজে লাগাই।"

হাত দিয়ে চোখ ঢাকা দিয়ে সুন্দরী বলল—"এনরিকো যদি জানতে পারে তার রহস্য ফাঁস করেছি, আমার ছাল ছাড়িয়ে নেবে।"

"জানতে পারলে তো।"

"মিস্টার বণ্ড, এনরিকো জানে না এমন কিছু নেই। স্রেফ অনুমানের ওপরেও মরণ:মার মারতে পেছপা হয় না ও।" বলেই চকিতে ঘড়ির দিকে তাকাল সুন্দরী। "কে জানে পিছু নিয়ে এখানেও এসেছে কিনা। ভয়ানক সন্দিগ্ধ মন ওর।" এবার গলা কেঁপে যায় লিল বমের। চোখে মুখে ভয়ার্ত ভাব—"আপনি বরং যান। এখানে আসাটাই ভুল হয়েছে।"

সোজাসুজি ঘড়ির পানে তাকায় বণ্ড। সাড়ে তিনটে। ঘাড় ফেরায়। ছাতার পেছন দিক দিয়ে বালুকাবেলার ওপর দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দূরে···ভাঙা কাঠের ঘর পর্যন্ত।

তিনজন ষণ্ডামার্কা পুরুষ তালে তালে পা ফেলে আসছে এই দিকে। রোদে তেতে ওঠা বালির হলকায় যেন থিরথির করে নাচছে ভাঙা কাঠের ঘর। নাচছে তিনমূর্তি। তবুও আসছে। বুঝি কুচকাওয়াজ করছে। তালে তালে পা ফেলছে। অবিকল ফৌজী সৈন্যের মত।

টপ করে উঠে দাঁড়াল বণ্ড। বলল নিরস স্বরে—"বুঝেছি। কলম্বোকে বলবেন, এই মুহূর্ত থেকে তার জীবনী লেখা শুরু করলাম। লেখা আমার থামবে না। চললাম।" বলেই দৌড়ালো উপদ্বীপের ছুঁচোলো প্রান্তের দিকে। সেখান থেকে ঘুরে গাঁয়ের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছোনো কঠিন হবে না।

নির্জন সৈকতে ত্রিমূর্তির মধ্যে যেন জোরে হাঁটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। দ্রুত ছন্দে আন্দোলিত হল কনুই আর পা—তাল মিলিয়ে বৃদ্ধি পেল গতিবেগ। একজন হাত নেড়ে ইসারা করল শায়িত সুন্দরীর কাছে এসে। হাত নেড়ে সায় দিল লিল বম। তারপর শুল পাশ ফিরে। মানুষ শিকারে যেন অরুচি—তাই আর ফিরেও তাকালো না।

ছুটন্ত অবস্থায় নেকটাই খুলে পকেটে রাখল বণ্ড। গরমে দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে গা বেয়ে। তিন ফেউ মূর্তিরও সেই অবস্থা। সহনশক্তি কার বেশী, এ যেন তারই পরীক্ষা। উপদ্বীপের ডগায় পৌঁছে লাফিয়ে উঠল সমুদ্র প্রাচীরের ওপর। তাকালো পেছনে। শর্টকাট করছে দুই ফেউ। মড়ার মাথা খুলি আঁকা বিপদ সংকেতের পরোয়া না রেখে ঢুকে পড়েছে মাইন পোঁতা অঞ্চলে। ব্যবধান দ্রুত কমে আসছে। চওড়া পাঁচিল বেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ালো বণ্ড।

সার্ট ঘামে সপসপে হয়ে গেছে। পা টনটন করছে। মাইল খানেক দৌড়ানো হয়ে গেছে। আর কদ্দূর? পাঁচিলের মাঝে মাঝে সেকেলে কামানের কংক্রিট স্তম্ভ। আরও মাইলখানেক গেলে তবে

যদি গাঁয়ের মধ্যে ঢোকা যায়। এদিকে স্যুট পর্যন্ত ভিজে গেছে ঘামে, ট্রাউজার্সের ভিজে কাপড়ে পা আটকে আটকে যাচ্ছে। পেছনে তিনশ গজ ব্যবধানে আসছে এক মূর্তি। ডাইনে বালির টিলা ভেঙে আরো দুজন।

বণ্ড ফন্দী আঁটছিল ছোটার বেগ কমিয়ে এনে হাঁটতে হাঁটতে পেছনের তিন ছিনেজোঁক ফেউকে গুলি মেরে কুপোকাৎ করার। এমন সময়ে উপর্যুপরি দুটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

প্রথম দৃশ্যটা দেখা গেল সামনে। জনা ছয়েক জেলে। হাতে বর্শার মত কি যেন। কেউ দাঁড়িয়ে জলে কেউ পাঁচিলের গা ঘেঁসে।

দ্বিতীয় নাটকটা ঘটল ঠিক পেছনেই। আচম্বিতে বালির পাহাড় থরথরিয়ে কেঁপে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণে। মাটি, বালি আর একটা মানুষের খণ্ড-বিখণ্ড হাত-পা-ধড় ফোয়ারার মত ছিটকে গেল শূন্যে। ধাক্কার ঢেউ মাটি বয়ে এসে কাঁপিয়ে দিল বণ্ডকেও। গতি কমিয়ে আনল বণ্ড। বালি পাহাড়ের দ্বিতীয় আগন্তুকও দাঁড়িয়ে গিয়েছে। পাথরের মূর্তির মত নিস্পন্দ। ঝুলেপড়া চোয়াল কাঁপছে ভয়ার্ত ঘড়-ঘড়ানিতে। পর মুহূর্তেই দুহাতে মাথা চেপে ধরে আছড়ে পড়ল বালির ওপর। লক্ষণ দেখেই বুঝল বণ্ড, কেউ না আসা পর্যন্ত ও আর নড়ছে না। এসে ওকে নিয়ে যাবে, তবেই ভয়ের ফাঁদ থেকে মুক্তি পাবে বিটলে বদমাস।

হাঁফ ফেলল বণ্ড। বাকী রইল একটা শয়তান। পথও বেশী নয়। শ'দুইগজ গেলেই জেলেদের দলে ভিড়ে পড়া যাবে। মনে মনে কয়েকটা ইটালীয়ান শব্দ সাজিয়ে নিল বণ্ড। জেলেরা এদিকেই তাকাচ্ছে। বণ্ডকে দেখছে। কিন্তু কী আশ্চর্য। বর্শাধারী জেলেদের দেখতে পেয়েও পেছনের ছিনেজোঁক রাস্কেলটা এখনো পাঁই পাঁই করে তার দিকেই আসছে। দূরত্ব মাত্র শ'খানেক গজ। হাতে একটা রিভলবার।

সামনের জেলেরাও ছড়িয়ে পড়েছে। অবরোধ করেছে বণ্ডের পথ। মাঝে একটা মস্ত লোক। কোমরে লাল রঙের স্নান করার জাঙিয়া। সবুজ মুখোস মাথার ওপর টেনে তোলা।

তুহাত পাছায় রেখে সিধে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।

হাতে লাগানো নীল রঙের সাঁতারু-পাখনা বেরিয়ে রয়েছে তুপাশে। দূর থেকে মনে হল যেন রঙীন ফিল্মের সেই ব্যাঙ-মানুষ —'টোড-হলের' মিস্টার টোড। বণ্ডের মুখের হাসি কিন্তু মুখেই মিলিয়ে গেল। ছুটছিল, এখন হাঁটতে লাগল। হাঁপাতে লাগল হাপরের মত। ঘর্মাক্ত হাতটা আপনা হতেই চলে গেল কোটের নীচে —একটানে বার করে আনল রিভলবার। হারপুন বাগিয়ে জেলেরা তাগ করেছে বণ্ডকে। মাঝখানের লোকটা এনরিকো কলম্বো।

কলম্বো দেখল পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে বণ্ড। গজ বিশেক দূরে আসার পর বলল শান্তকণ্ঠে—"সিক্রেট সার্ভিসের মিস্টার বণ্ড, খেলনা পিস্তলটা নামিয়ে রাখুন। নড়বেন না—ওখানেই দাঁড়ান। সি-ও-টু হারপুন বন্দুক এত কাছ থেকে ফসকায় না।" ইংরাজীতে পাশের লোককে—"গত হপ্তায় অ্যালবেনিয়ান বদমাসটাকে কত গজ দূর থেকে গেঁথেছিলে মনে আছে?"

"বিশগজ। হারপুন এ ফোঁড় ও ফোঁড় হয়ে গিয়েছিল। কি মোটাই না ছিল লোকটা—এঁর তুগুণ তো বটেই।"

থমকে গেল বণ্ড। পাশেই লোহার চ্যাটালো খুঁটি দেখে বসল আয়েশ করে। রিভলবারটা রাখল কোলে—নলচে ফেরানো রইল কলম্বোর মস্ত ভুঁড়ির দিকে।

বলল—"পাঁচটা হারপুন দিয়েও আমার একটা বুলেটকে আটকানো যাবে না, কলম্বো। আমি মরবো, আপনিও মরবেন।"

হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে সায় দিল কলম্বো। বণ্ডের পেছনেই পা টিপে টিপে আসছিল পিছু নেওয়া সেই আততায়ী। রিভলবারের

কুঁদো দিয়ে একবার মাত্র মোক্ষম ঘা মারল বণ্ডের করোটি আর ঘাড়ের সন্ধিস্থলে।

মাথায় চোট নিয়ে অজ্ঞান হবার পর জ্ঞান ফিরে পেলেই দারুণ গা বমি বমি করে। অসহ্য সেই অবস্থাতেও ছুটি অনুভূতি প্রবল হল বণ্ডের মগজে। প্রথম, সে রয়েছে সমুদ্রে ছলন্ত জাহাজের মধ্যে। দ্বিতীয়, কে যেন একটা ভিজে তোয়ালে দিয়ে তার কপাল মুছিয়ে দিয়ে ভাঙাভাঙা ইংরাজীতে প্রবোধ দিচ্ছে।

আবার বাঙ্কে এলিয়ে পড়ল বণ্ড। শরীরে শক্তি যেন আর নেই। কেবিনটা ছোট্ট। মেয়েলী সুগন্ধ ভাসছে। রুচিসম্মত পর্দা। দেওয়ালের রঙে একই রুচির ছাপ। একজন নাবিক ঝুঁকে রয়েছে বণ্ডের মুখের ওপর। চেনা-চেনা লাগল লোকটাকে। জেলে সেজে হারপুনধারীদের মধ্যে ছিল বোধহয়। বণ্ড চোখ খুলতেই হাসি মুখে বলল—"ভালো তো? ব্যথা-ব্যথা করছে, না? সেরে যাবে। দাগও মিলিয়ে যাবে চুলের আড়ালে। মেয়েদের চোখে পড়বে না।"

ফ্যাকাশে হেসে ঘাড় নাড়ল বণ্ড। নাড়তেই দারুণ যন্ত্রণায় চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে এল। কব্জি-ঘড়িতে দেখল সাতটা বাজে। ছুচারটে কথা বলে বাইরে গেল লোকটা। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গেল, বন্ধ করল না।

ভাবগতিক দেখে মনে হল না বণ্ডকে শত্রু মনে করা হচ্ছে। আচরণ সেরকম নয়। কে জানে কি মতলব কলম্বোর। রফায় আসতে চায় মনে হচ্ছে। উঠে বসল বণ্ড। মুখ ধুয়ে সিগারেট ধরালো। ড্রয়ারের মধ্যেই পেল নিজের যা-কিছু—রিভলবার ছাড়া।

নটা নাগাদ চেনা নাবিকটা এসে বণ্ডকে নিয়ে গেল অন্য ঘরে। সাজানো ঘর। টেবিলের ছুপাশে ছুটি চেয়ার। নিকেল-চকচকে

ট্রলীতে থরে থরে সাজানো খাবার। পোর্টহোল খুলে বণ্ড দেখল, অন্ধকার দিগন্ত, একথোকা হলদেটে আলোক-কণা।

খটাং করে হ্যাচওয়ের ছিটকিনি খুলে ঘরে ঢুকল কলম্বো। কৌতুক আর দুষ্টামি যেন নেচে নেচে উঠছে দুই চোখে। চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল—"বন্ধু, আসুন, বসুন, খান, কথা বলুন। কাজের কথা হোক। কি নেবেন? জিন, হুইস্কি, শ্যাম্পেন? সারা বোলোগনা চষেও এমনি খাসা সসেজ কোথাও পাবেন না। আমার বাগানের অলিভ। সেঁকা চীজ, তাজা ডিম, রুটি, মাখন। সাদামাটা খাবার, কিন্তু খেয়ে তৃপ্তি পাবেন। আসুন, দৌড়ঝাঁপ তো কম হয় নি। ক্ষিদে নিশ্চয় পেয়েছে।"

কলম্বোর সংক্রামক হাসি বণ্ডকেও হাসালো। হুইস্কিতে সোডা মিশিয়ে নিয়ে বসল চেয়ারে। বলল—"এত কাণ্ডকারখানার দরকার ছিল কি? সোজা পথেই তো দেখা করা যেত। আপনার স্যাঙাৎ ঐ হাঁদারাম মেয়েটাকেও বলিহারি যাই। যেচে আপনার ফাঁদে পা দেব বলেই তো এসেছি। চীফকে তখনি বলেছিলাম, মেয়েটার কথাবার্তা সুবিধের নয়। এরকম একটা কিছু আঁচ করা গিয়েছিল বলেই ব্যবস্থা করে এসেছি। আগামীকাল দুপুর বারোটার মধ্যে ছাড়া না পেলে আন্তর্জাতিক পুলিশ আর ইটালীয়ান পুলিশ আপনাকে তুলো ধোনা করে ছাড়বে।"

ভড়কে গেল কলম্বো। বলল—"ফাঁদে পা দিচ্ছেন যদি জানতেনই তো আমার তিন সাঙাৎকে এড়িয়ে পালাচ্ছিলেন কেন? ওদের পাঠিয়েছিলাম আপনাকে আমার জাহাজে নিয়ে আসার জন্যে। এলেই পারতেন। অত ছুটোছুটি করার ফলে হল কি? না, আমার দলের একজন কমলো। আপনার খুলিও চূরমার হতে হতে বেঁচে গেল। বুঝি না কি দরকার ছিল এই প্রহসনের।"

"লোক তিনটের চেহারা মোটেই ভাল লাগেনি আমার। কারা

খুনী আর কারা খুনী নয়—দূর থেকে দেখলেই চিনতে পারি। ভাবলাম, উজবুকের মত ঠ্যাঙাড়ে দিয়ে ঠেঙিয়ে ঢিট করবার মতলব আপনার। ঠ্যাঙাড়ে আনার দরকার ছিল কি? লিল বম একাই তো আনতে পারত আমাকে।”

মাথা নাড়তে নাড়তে কলম্বো বললে—“লিল তো আর কিছুই চায়নি, শুধু আপনার পেট থেকে বেশ কিছু কথা বার করে নিতে চেয়েছিল। এখন যা ঘটল, তাতেও মর্মান্তিক চটেছে আমার ওপর। একে তো খাঁটি বন্ধু পাওয়া মুস্কিল। তার ওপর এক বিকেলেই দু'দুটো শত্রু আমি বানালাম।” সত্যসত্যিই মুষড়ে পড়ে কলম্বো। ইয়া মোটা খানিকটা সসেজ কঁ্যাচ করে কেটে নিয়ে এক কামড়ে ছাড়িয়ে নিল বাইরের ছাল। মুখে ঠেসে চিবুতে লাগল কচ কচ করে। মুখভর্তি। তা সত্ত্বেও একগেলাস শ্যাম্পেন গলায় ঢেলে আধচিবোনো সসেজ ধুইয়ে নামিয়ে দিল পাকস্থলীতে। বলল—“উদ্বেগ বাড়লেই খাওয়া বাড়ে আমার। কিন্তু যা খাই, তা হজম করতে পারি না কিছুতেই। এই মুহূর্তে আমার উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছেন আপনি। বলছেন, ইচ্ছে করলেই বিনা ঝঞ্ঝাটে দেখা করা যেত। কিন্তু তা কি করে জানব বলুন। শুধুমুধু ম্যারিও মরলো। মরার দোষটাও পড়ল আমার ঘাড়ে। অথচ ওকে আমি বলিনি মাইন পোঁতা জমি পেরিয়ে শর্টকাট করতে।” দমাস করে টেবিলে ঘুসি মারল কলম্বো—“না না এ দোষ আমার নয়—দোষ আপনার। দায় আপনার। আপনিই তো কথা দিয়ে এসেছিলেন খুন করবেন আমাকে। মনে খুন বাইরে বন্ধুত্ব—একি হয়? খুন করব মনে করে কেউ বন্ধুর মত দেখা করতে পারে? বলুন, সত্যি কিনা বলুন।” এক হ্যাঁচকায় বেশ খানিকটা পাকানো রুটি টেনে নিয়ে মুখে ঠাসল কলম্বো। দুই চোখ জ্বলতে লাগল চুল্লীর-মত।

“বলছেন কি?” বণ্ড বিস্মিত।

বাকী রুটিটা খাওয়া হল না। ছুঁড়ে দিয়ে তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠল কলম্বো। উত্তেজিতভাবে পায়চারী শুরু হল সেলুনের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত। কিন্তু চাহনি আটকে রইল বণ্ডের ওপর। পরক্ষণেই একটানে খুলল একটা ড্রয়ার। ভেতরে একটা টেপ-রেকর্ডার। বণ্ডের চোখে চোখ রেখেই মেশিনটাকে বার করে আনল টেবিলের ওপর। মুখে কিছু বলল না। টিপুনি পড়ল একটা সুইচে।

গলার পিঁ-পিঁ আওয়াজ শুনেই হুইস্কির গেলাস ঠোঁটের কাছে তুলল বণ্ড। চোখ রইল মেশিনের ওপর। পিঁ-পিঁ কণ্ঠ বলছে—'ঠিক। খবর দেবার আগে সর্তটা জানানো দরকার। ইয়েস?' একই গলায়—'আমেরিকান ডলারে চাই দশহাজার ডলার। কাল লাঞ্চ খাবার আগেই ছোট নোটে পুরো টাকা আনবেন…যদি মরেও যান, এত কথা কোত্থেকে জানলেন বলতে পারবেন না…গ্যাংয়ের চাঁই লোকটা অতি জঘন্য লোক। তাকে শেষ করতে হবে—খুন।' কান খাড়া করল বণ্ড। এবার শোনা যাবে নিজের কণ্ঠ। অনেকক্ষণ বিরতি। এর পর আসছে শেষ সর্তে রাজী হবার পালা। কি বলেছিল বণ্ড? 'কথা দিতে পারছিনা। সে ভাবনা আপনার। কেউ যদি আমাকে মারতে আসে, আমি তাকে মারব। প্রাণে মারব। নইলে নয়।'

খটাস করে মেসিন বন্ধ করল কলম্বো। এক ঢোকে হুইস্কি শেষ করল বণ্ড। বলল—"বারে। আমি যে খুন করব কথা দিয়েছি, শুনে তো বোঝা গেল না।"

বিষন্ন চোখে তাকাল কলম্বো—"ইংলিশম্যানের একথার মানে আমার কাছে একটাই। খুন করা আপনার মনে ছিল। যুদ্ধের সময়ে ইংরেজের হয়ে লড়েছি। কিংস মেডেল পেয়েছি। দেখবেন?" বলেই ফস করে পকেট থেকে টেনে বার করল রূপোর ফ্রিডাম মেডেল।

কলম্বোর চোখ থেকে চোখ সরালো না বণ্ড—"টেপে তো আরো কথা আছে। সব কি মিথ্যে? ইংরেজের হয়ে লড়া ফুরিয়েছে। এখন লড়ছেন তাদের বিরুদ্ধেই—টাকার লোভে।"

ঘোঁৎ করে উঠল কলম্বো। তর্জনী দিয়ে মেশিনে খোঁচা মারতে মারতে বললে অস্থির গলায়—"শুনেছি, সব শুনেছি, বস্তা বস্তা ধাপ্পা!" বলেই আবার প্রচণ্ড ঘুসি টেবিলের ওপর। ঝনঝন শব্দে নেচে উঠল গেলাসগুলো। কড়িকাঠ কাঁপিয়ে সে কি চীৎকার—"মিথ্যে! মিথ্যে! সব মিথ্যে!" বলেই ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত লাফিয়ে উঠল। ঠিকরে পড়ল চেয়ার। খপ করে তুলল হুইস্কির বোতল। হড় হড় করে আঙুল চারেক পরিমাণ ঢালল বণ্ডের গেলাসে। ফের গিয়ে বসল চেয়ারে। শ্যাম্পেনের পুরো বোতলটা কাছে টেনে নিয়ে বললে অনেকটা সংযত কণ্ঠে—"সব অবশ্য মিথ্যে নয়। তর্ক করলাম না সেই জন্যেই। বিশ্বাস করতেন না। ফাঁড়িতে টেনে নিয়ে যেতেন, ঝামেলায় ফেলতেন, আমাকে খুন করতে পারুন না পারুন কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত করতেন। আমার কারবার ডকে উঠিয়ে ছাড়তেন। তাই ঠিক করলাম, ফাঁকা কথায় কাজ নেই; হাতেনাতে আপনাকে দেখিয়ে দেব। যে সত্য খুঁজতে এসেছেন ইটালীতে, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা চাক্ষুষ দেখবেন। কাল ভোর হবার আগেই আপনার কাজ ফুরোবে, নটে গাছটিও মুড়োবে।"

বণ্ড শুধু বলল—"ক্রিস্ট্যাটোসের কথায় মিথ্যে নেই কোথায়?"

"মাই ফ্রেণ্ড, আমি স্মাগলার। চোরাই চালানদার। শুল্ক ফাঁকিতে ওস্তাদ। সত্যি শুধু—এইটুকু। সারা ভূমধ্যসাগরে খুব সম্ভব আমার চাইতে দুঁদে স্মাগলার আর কেউ নেই। ইটালীতে পাচার আমেরিকান সিগারেটের অর্ধেক আমি আনাই ট্যানজিয়ার থেকে। সোনা? ব্ল্যাক মার্কেটের একমাত্র সাপ্লায়ার হলাম আমি। হীরে? বেরুটে আমার নিজের যোগাড়ে রয়েছে—সরাসরি যোগাযোগ আছে সিয়েরা

লিয়োন আর সাউথ আফ্রিকা পর্যন্ত। পুরোনো আমলে সোনা হীরে তত পাওয়া যেত না। তখন চালান দিতাম অরিওমাইসিন, পেনিসিলিন জাতীয় ওষুধপত্র। আমেরিকান প্রভাব যেসব হাসপাতালে, তার প্রতিটিতে ঘুষ দিতে হত। এমন কি সিরিয়া, পারস্য থেকে ডানা কাটা পরীদের এনে নেপলসের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতেও কসুর করিনি। জেল পালানো কয়েদীদেরও সীমান্ত পার করে দিয়েছি মোটা দাঁও পিটে। কিন্তু—"আবার কলম্বোর বজ্রমুষ্টি প্রচণ্ড শব্দে নেমে এল টেবিলের ওপর, "আফিং, কোকেন, মরফিন, হিরোইন—নো! নেভার! জীবনে ও পথ মাড়াইনি। নোংরা জঘন্য পাপ! পাপ আর কোথাও নেই—আছে শুধু এতে।" শূন্যে উঠল বজ্রমুষ্টি—"মাই ফ্রেণ্ড, মায়ের নামে দিব্বি গেলে বলছি, ও ব্যবসা আমার নয়।"

এতক্ষণে যেন অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিল বণ্ড। আলোর দিশে দেখা গেল সেই মুহূর্তে। কলম্বোর কথা অবিশ্বাস করা যায় না। লোভী বোম্বেটে বেচারীর ওপর মনটাও নরম হয়ে এল। ক্রিস্ট্যাটোস বড় জবর চাল চেলেছে। মুখে বললে—"কিন্তু আপনাকে ফাঁসিয়ে ক্রিস্ট্যাটোসের লাভ কি?"

"মাই ফ্রেণ্ড, ক্রিস্ট্যাটোস কূটবুদ্ধির জাহাজ। ও যে কত গভীর জলের মাছ তা কল্পনায় আনা যায় না। এতবড় দুমুখো খেলার নজীর স্মাগলিং ইতিহাসে আর দুটি নেই। আমেরিকান গুপ্তচরদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে এক আধটা চুনোপুঁটিকে ধরিয়ে দিতে হয়। কিন্তু সে-চাল ইংলিশ খেলায় চলবে না। এত মাল পাচার হচ্ছে ইংল্যাণ্ডে যে কহতব্য নয়। মোটা ব্যবসার মোটা চুনোপুঁটি দরকার। তাই এবারে বলি দেওয়া হচ্ছে আমাকে। দিলে ক্রিস্ট্যাটোস আড়ালেই থেকে যায়, ওর কারবারও রক্ষে পায়। দুদিন মেহনৎ করলে খোলাম কুচির মত টাকা ওড়ালেই আমার টিকি ধরে ফেলতেন। আমার কাজ কারবারও ফাঁস হয়ে যেত। যতই ঝুঁকতেন

আমার দিকে, ততই আসল রাঘব বোয়ালের কাছ থেকে দূরে সরে আসতেন। শেষকালে আমাকে ফাটকে পুরে তবে ছাড়তেন। আসল পালের গোদারা হেসে কুটিপাটি হত আপনার লম্ফঝম্প আর আমার কুপোকাৎ অবস্থা দেখে।"

"ক্রিস্ট্যাটোস আপনাকে কুপোকাৎ করতে চায় কেন?"

"মাই ফ্রেণ্ড, খবর গজ গজ করে আমার পেটে। আমি জানি না, এমন কিছু নেই। স্মাগলিং করতে গিয়ে মাঝে মাঝে মাথা ঠোকাঠুকি হয়, তুদলে মারপিটও হয়ে যায়। এই তো সেদিন এই জাহাজ নিয়েই একহাত লড়লাম অ্যালবেনিয়ার একটা বোটের সঙ্গে। ওদের এক ব্যাটাই প্রাণে বেঁচে ছিল। অন্তর টিপুনি দিতেই তার পেট থেকে অনেক কথা বেরিয়ে এল। তারপর একটা সাংঘাতিক ভুল করলাম। শূওরটাকে টির‍্যানাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম। সেই থেকে বাস্টার্ড ক্রিস্ট্যাটোস আমার পেছনে লেগেছে। তবে কি জানেন," নেকড়ের মত দাঁত খিঁচিয়ে হাসল কলম্বো—"ও জানে না আরও একটা মারাত্মক খবর আমি জেনে বসে আছি। সেই খবর জেনেই যাচ্ছি কাল সকালে এক টক্কর লড়তে। সান্তা মেরিয়ার আনকোনার উত্তরে ছোট্ট একটা মাছধরার বন্দর আছে—হাতাহাতি হবে সেইখানেই। দেখা যাক," বলে নির্মম হাসল কলম্বো—"কে হারে কে জেতে।"

নরম গলায় বণ্ড বলল—"এত খাটছেন, নেবেন কত?"

"এক পয়সাও নয়। কাকতালীয় বলতে পারেন, কিন্তু আপনার আমার স্বার্থ এখন একই। শুধু একটা সর্ত। আজ যা বললাম, তা আপনি, আমি আর দরকার হলে আপনার লণ্ডনের কর্তা ছাড়া আর কেউ যেন না জানে। কথাটা যেন ইটালীতে ফিরে না আসে। রাজী?"

"রাজী।"

উঠে দাঁড়ালো কলম্বো। ড্রয়ার খুলে বার করে আনল বণ্ডের

রিভলবার। "নিন মাই ফ্রেণ্ড, দরকার হলেও হতে পারে—তাই কাছেই রাখুন। পারেন তো খানিকটা ঘুমিয়ে নিন। ভোর পাঁচটায় রাম আর কফি পাবেন।" হাত বাড়িয়ে দিল কলম্বো। হাতে হাত মেলালো বণ্ড। নিমেষ মধ্যে বন্ধু হয়ে গেল দুজনে দুজনের।

'কলম্বিনা' জাহাজের মাঝিমাল্লা বলতে বারোজন। ছোকরাবয়েসী, লোহাপেটা চেহারা। কলম্বো নিজের হাতে মগভর্তি কফি আর রাম দিল প্রত্যেকের হাতে। সেলুন ঘরে তখন লণ্ঠন জ্বলছে। ঝড়ের লণ্ঠন। ঘর ছাড়া গোটা জাহাজ অন্ধকার। মনে মনে এক চোট হেসে নিল বণ্ড। 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' উপন্যাসে বর্ণিত উত্তেজনা আর যড়যন্ত্রের আমেজ মন্দ লাগছে না। কলম্বো বারো সাঙাতের প্রত্যেকের হাতিয়ার টেনে দেখল, পরখ করল, তারিফ করল। হাতিয়ার বলতে 'লাগার' রিভলবার আর ভাঁজ করা ছুরী। দেখে শুনে বণ্ডের মনে হল, মহা ঘোড়েল লোক এই এনরিকো কলম্বো। জীবনে অনেক ঝড় ঝাপটা মাথা পেতে নিয়েছে। অ্যাডভেঞ্চার, দুঃসাহস, রোমাঞ্চ ভরা জীবনে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষেছে বহুবার। এ জীবন ক্রিমিন্যালের জীবন—অপরাধে সমাকীর্ণ। মুদ্রাআইন ভণ্ডুল করেছে, তামাকের একচেটিয়া ব্যবসার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে, কাস্টমস আর পুলিশকে ঘোল খাইয়েছে। তা সত্ত্বেও লোকটার হাবভাবে এমন একটা নাবালক-নাবালক ভাব যে বদমাইসদের শিরোমণি বলে ঠিক মনে হয় না। কুকাজগুলোকেও করাল কিছু মনে মনে হয় না। কি রকম যেন অপরিপক্ক নষ্টামির ছোঁয়াচ সব কিছুতেই।

ঘড়ি দেখল কলম্বো। বারো স্যাঙাৎকে ঘর থেকে সরিয়ে লণ্ঠনের সলতে কমিয়ে দিল। ভোরের শুচি-শুভ্র আলোর আভা তিমির-রাতকে সবে ম্লান করতে শুরু করেছে। বণ্ডকে নিয়ে উঠল ডেকে।

ঢিমেতালে মিশমিশে কালো পাথুরে উপকূল ঘেঁসে এগোচ্ছে জাহাজ। সামনের দিকে তাকিয়ে কলম্বো বললে—"মোড় ঘুরলেই বন্দর। এখনো কেউ দেখতে পায়নি আমাদের। জেটিতে ঠিক এই জাহাজের মতই আরও একটা জাহাজ দেখার আশায় আছি। র‍্যাম্পের ওপর দিয়ে দেখবেন হয়তো বিস্তর নিউজপ্রিণ্ট কাগজের রোল নেমে যাচ্ছে সরাসরি জাহাজ থেকে গুদোমের ভেতর। নিরীহ দর্শন কাগজ। পাহাড়ের মোড় ঘুরেই পুরোদমে গিয়ে পাশে ভিড়ব আমারা। রেলিং টপকে যাবো ও জাহাজে। মারপিট হবেই। মাথাও ভাঙবে। গুলি চলবে কিনা জানিনা। ওরা না চালালে চালাবো না। যদি চালাই তো আপনি হাত লাগাবেন। তাতে যদি আপনার মৃত্যু হয় জানবেন আপনি শহীদ হয়ে গেলেন। কেননা আপনার দেশের শত্রুর হাতেই মরলেন। এরা আমার দেশেরও শত্রু, মরতে আমিও ভয় পাই না। ও জাহাজ অ্যালবেনিয়ার জাহাজ। মাঝিমাল্লাও অ্যালবেনিয়ার হুঁদে গুণ্ডা।"

"অলরাইট।"

বণ্ডের মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই ইঞ্জিন রুম টেলিগ্রাফে টং করে আওয়াজ হল। পায়ের তলায় থরথর করে কেঁপে উঠল পাটাতন। পাহাড়ের মোড় ঘুরে ক্ষুদে জাহাজটা দশ নট গতিবেগে ধেয়ে গেল বন্দর অভিমুখে।

কলম্বো বাজে কথা বলে নি। পাথুরে জেটির গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে একটা জাহাজ। পতপত করে উড়ছে পালগুলো। ডেকের পেছন দিক থেকে কাঠের পাটাতন ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে ডাঙার ওপর গুদোমের দরজায়। ঢেউখেলানো টিনে ছাওয়া গুদোম। উন্মুক্ত দরজায় নিঃসীম অন্ধকার। ভেতরে টিমটিম করে জ্বলছে কয়েকটা বিদ্যুৎ বাতি। জাহাজের ডেকে থরে থরে সাজানো নিউজপ্রিণ্টের পেল্লায় পেল্লায় রোল। ডেক ঠাসা এই রোলে। কাঠের ঢালু

পাটাতনে একটা একটা রোল নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। নিজের ভারেই গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে নিউজপ্রিন্ট—হুড়মুড় করে ঢুকে যাচ্ছে সোজা গুদোমের মধ্যে। জনাবিশেক পুরুষ ব্যস্ত তদারকি কাজে। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে না পড়লে কাহিল করা মুস্কিল হবে। কলম্বোর জাহাজ আর ও জাহাজের মধ্যে ব্যবধান মাত্র আর পঞ্চাশ গজ। ওদের দুজন এদিকেই তাকিয়ে আছে। একজন দৌড়ে নেমে গেল। তার আগেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে হুকুমজারী করল কলম্বো। ইঞ্জিন থামল। থেমেই ফের চালু হল উল্টোদিকে। ব্রীজের ওপর দপ করে জ্বলে উঠল একটা প্রকাণ্ড সার্চলাইট। গায়ে গায়ে ভিড়তেই সার্চলাইটের আলোয় দিন হয়ে গেল অ্যালবেনিয়ান ট্রলারের ডেক। গায়ে গা ঠেকতে না ঠেকতেই লোহার আঁকশি দিয়ে রেলিংয়ে রেলিং আটকে দিল কলম্বোর স্যাঙাৎরা। দিয়েই টপকে গেল ও জাহাজে। পুরোভাগে দেখা গেল এনরিকো কলম্বোকে।

বণ্ড অন্য ফন্দী এঁটেছিল। শত্রুপক্ষের জাহাজে পা দিয়েই এক-দৌড়ে ডেক পেরিয়ে রেলিং টপকে মারল ঝাঁপ। বারো ফুট নীচেই পাথরের জেটি। বেড়ালের মত চার হাতপায়ের ওপর জেটিতে অবতীর্ণ হল বণ্ড। কিছুক্ষণ আর নড়ল না। গুঁড়ি মেরে ভেবে নিল পরবর্তী পন্থা। ডেকের ওপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে। গোড়ার দিকের একটা গুলিতে চূরমার হল সার্চলাইট। ভোরের আবছা আলোয় অব্যাহত রইল ফায়ারিং। শত্রুপক্ষের একজন চার হাত পা ছড়িয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল ঠিক সামনেই। আর নড়ল না।

লাইট মেশিনগান চালু হল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। গুদোমের মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে এল আগুন। ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ধেয়ে আসছে ডেক লক্ষ্য করে। পাকা গোলন্দাজ সন্দেহ নেই—আনাড়ি হাত নয় মোটেই।

সেইদিকেই দৌড়োলো বণ্ড, তবে জাহাজের ছায়ায় গা মিলিয়ে।

তা সত্ত্বেও দেখে ফেলল মেশিনগানধারী। এক ঝাঁক বুলেট সঙ্গে সঙ্গে ধেয়ে এল বণ্ডকে লক্ষ্য করে। সাঁই সাঁই শব্দে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল আশপাশ দিয়ে, ঠিকরে গেল জাহাজের লোহার পাতে লেগে। ঝাঁপ দিল বণ্ড। ঢালু পাটাতনের আড়ালে গিয়ে আছড়ে পড়ল উপুড় হয়ে। বুলেট এখনো আসছে। মারণ-বুলেট। মাথা কুটছে মাথার ওপরকার ঢালু পাটাতনে। কেঁচোর মত বুকে হেঁটে এগিয়ে চলল বণ্ড। স্বল্প পরিসর ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। তবুও যেতে হবে বণ্ডকে। যখন আর যাওয়া যাবে না, কাঠের পাটাতন যখন মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে যাবে, তখন হয় বাঁয়ে নয় ডাইনে ছিটকে যেতে হবে বণ্ডকে।

সহসা ধপাধপ দুমদাম শব্দ শোনা গেল মাথার ওপরে। গড় গড় দড়াম শব্দে কি যেন গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। বণ্ড বুঝল কি ব্যাপার। কলম্বোর এক সাঙাৎ নিশ্চয় দড়ি কেটে দিয়েছে। কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে দিয়েছে পাহাড় প্রমাণ সবকটা নিউজপ্রিণ্ট রোল। এই হল সুবর্ণ সুযোগ। পাটাতনের ছাউনি থেকে ছিটকে গেল বণ্ড —বাঁদিকে। মেশিনগানধারী নিশ্চয় আশায় আছে বণ্ড ডানদিক দিয়ে বেরোবে। কেননা ঘাতক নিজেই রয়েছে সেই দিকেই ওৎ পেতে—গুদোমের দেওয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে।

শত্রু-মারণাস্ত্রের ঝকঝকে নলচে ঈষৎ ঘুরে গিয়ে বণ্ডকে তাগ করার আগেই এক সেকেণ্ডের মধ্যে দু' দুবার গুলিবর্ষণ করল বণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে খাঁচাছাড়া হল ঘাতকের আত্মারাম। নিষ্প্রাণ আঙুল তখনও ট্রিগার টিপে থাকায় এক পাক টলে গেল মেশিনগান, এলো-পাতাড়ি গুলিবর্ষণ করতে করতে ঘাতকের লাশ নিয়েই আছড়ে পড়ল মাটিতে। থামল মুহুর্মুহু আগুন-বমি।

টেনে দৌড়োলো বণ্ড—লক্ষ্য গুদোমের খোলা দরজা। মাঝ-পথেই সহসা পা পিছলোলো—দড়াম করে সটান আছড়ে পড়ল

মাটিতে। কিছুক্ষণ নড়বার ক্ষমতাও রইল না। চোট লেগেছে মাথায়। মুখে কালচে মত কি একটা তরল বস্তু ঝর ঝর করে ঝরছে। 'ধুত্তোর' বলে চার হাতপায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল বণ্ড। ফের দৌড়োলো গুদোমের দিকে। একটু আগেই নিউজপ্রিন্টের পাহাড় হুড়মুড় করে নেমে এসেছে সেখানে। বণ্ড গাঢাকা দিতে চায় রোলগুলোর আড়ালে। একটা রোলের চাকলা উঠে গেছে মেশিন-গানের বুলেট বর্ষণে। কালচে বস্তুর ধারা ঝিরঝির করে ঝরছে ছেঁদা দিয়ে। একই বস্তুতে মাখামাখি হয়ে গিয়েছে বণ্ডের মুখ। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। এ গন্ধের আঘ্রাণ এর আগেও একবার পেয়েছে বণ্ড মেক্সিকোতে। কাঁচা আফিং! এ গন্ধ এত সহজে ভোলা যায় না।

মাথার খুব কাছ দিয়ে একটা বুলেট ককিয়ে উঠে গিয়ে বিঁধল গুদোমের দেওয়ালে। ট্রাউজার্সে রিভলবার মুছে নিয়ে বণ্ড ছিটকে গেল দরজার ভেতরে। কী আশ্চর্য! কেউ তো গুলি করল না। খোলা দরজায় ওর ছায়ামুর্তি লক্ষ্য করে দু' চারটে গুলি ভেতর থেকে ছুটে আসবে, এই আশাই করেছিল বণ্ড। কিন্তু কোথায় কি! নিবিড় শান্তি বিরাজ করছে ভেতরে। আলো নিভোনো। তবে ফিকে আলোয় দেখা যাচ্ছে দুপাশে থরে থরে সাজানো নিউজপ্রিণ্ট রোল। মাঝখানে রাস্তা। সঙ্কীর্ণ গলিপথ। গলির শেষে একটা দরজা। যেন হাতছানি দিচ্ছে বণ্ডকে।

প্রচণ্ড সেই প্রলোভনের মধ্যে মৃত্যুর গন্ধ পেল বণ্ড। পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল বাইরে—খোলা জায়গায়। গুলিবর্ষণ এখন আর তত ঘন ঘন নয়। কুমড়োপটাস শরীর নিয়ে থপ থপ করে দৌড়ে এল কলম্বো। বণ্ড বলল—'দরজায় দাঁড়ান। ভেতরে যাবেন না। কাউকে ঢুকতেও দেবেন না। আমি পেছনে যাচ্ছি।" জবাবের জন্যে দাঁড়ালো না। নেউলের মত ক্ষিপ্রচরণে গুদোমের দেওয়াল ঘুরে দৌড়োলো পেছন দিকে।

প্রায় পঞ্চাশ ফুট লম্বা গুদোমের শেষপ্রান্তে গিয়ে গতি হ্রাস করল বণ্ড। খরগোসের মত হাল্কা পায়ে এগোলো দেওয়ালে পিঠ দিয়ে। ঝটিতে উঁকি দিল পেছনের দরজার দিকে—মাথা টেনে নিল সঙ্গে সঙ্গে। পেছনের দরজায় ওৎপেতে রয়েছে একটা লোক। চোখ রয়েছে দরজার ছেঁদায়। হাতে একটা যন্ত্র। যন্ত্র থেকে তার বেরিয়েছে, দরজার তলা দিয়ে গেছে গুদোমের ভেতরে। একটা মিশমিশে কালো হুডখোলা গাড়ী দাঁড়িয়ে গা ঘেঁসে। ইঞ্জিন চলছে মৃদুশব্দে। গাড়ীর মুখ ফেরানো ধূলিধূসর মেঠো রাস্তার দিকে।

লোকটা ক্রিস্ট্যাটোস।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বণ্ড। লক্ষ্য যাতে অব্যর্থ হয়, তাই তুমুঠোর মধ্যে ধরল রিভলবার. দ্রুতগতিতে কয়েক ইঞ্চি সরে গিয়ে গুদোমের কোণ পেরিয়ে গুলিবর্ষণ করল ক্রিস্ট্যাসের পা লক্ষ্য করে। গুলি ফসকে গেল। পায়ের কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে ধূলোয় আলোড়ন তুলে উধাও হল বুলেট এবং পরে শোনা গেল বিস্ফোরণের গুরু গুরু গর্জন। টিনের দেওয়ালের প্রচণ্ড ধাক্কায় শূন্য পথে ছিটকে গেল বণ্ড।

মাটিতে পড়েই ফের উঠে দাঁড়াল সে। তুমড়ে মুচড়ে অদ্ভুত তেড়াবেঁকা আকার নিয়েছে গুদোম। প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে পড়ছে তাসের বাড়ীর মত।

ক্রিস্ট্যাটোস গাড়ীতে উঠে বসেছে এবং এর মধ্যেই এগিয়ে গেছে গজ বিশেক। পেছনের চাকায় ধূলো উঠছে ফোয়ারার মত। বণ্ড তু'পা ফাঁক করে শিকারীর ধ্রুপদী ভঙ্গিমায় দাঁড়াল। ওস্তাদ বন্দুক-বাজেরা নিশানা প্র্যাকটিস করতে গেলে এই ভঙ্গীই নেয়। খুব সাবধানে তাগ করল। গর্জে উঠল ওয়াল্থার রিভলবার। একবার ···তুবার···তিনবার। শেষ গুলি যখন ছুটল, ক্রিস্ট্যাটোস তখন পঞ্চাশ গজ দূরে। চলন্ত গাড়ীতেই সিঁটিয়ে উঠে পেছনে হেলে পড়ল ওর

দেহ। স্টিয়ারিং থেকে ঝাঁকি মেরে শূন্যে উঠল তুহাত। সারসপাখীর মত গলা লম্বা করে শূন্যে বারকয়েক মাথা ঠুকেই এলিয়ে পড়ল সামনে। ডান হাতটা এমনভাবে বেরিয়ে রইল বাইরে যেন সিগন্যাল দিচ্ছে ডাইনে মোড় নেওয়ার। দৌড়াতে যাচ্ছিল বণ্ড, ভেবেছিল গাড়ী এবার থামবে, কিন্তু মেঠো পথের গাড়ী-চলার গভীর খাতে চাকা বেধে যাওয়ায় অব্যাহত রইল গাড়ীর এগিয়ে চলা। নিষ্প্রাণ ডান পা-টাও নিশ্চয় এক্সিলেটর চেপে রয়েছে এখনো। তাই থার্ড গীয়ারের প্রচণ্ড বেগ নিয়ে বেগে উড়ে চলল হুডখোলা ল্যানসিয়া গাড়ী।

না দৌড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল বণ্ড। মেঠো পথের ওপর দিয়ে ধূলোর ঝড় তুলে অতি দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে ল্যানসিয়া। ভোরের কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে ক্রিস্ট্যাটোস। উলটে গেল না, টলমলও করল না—দূর হতে দূরে অপসৃত হল যেন এক আশ্চর্য ভৌতিক গাড়ী ভূতুড়ে হাতের চালনায়।

সেফটি ক্যাচ লাগিয়ে ট্রাউজার্স বেল্টে রিভলবার গুঁজে রাখল বণ্ড। ফিরে দেখল কলম্বো আসছে। আনন্দে আটখানা মূর্তি। মাড়ি পর্যন্ত বার করে সেকি দাঁতালো হাসি। কাছে আসতেই শিউরে উঠল বণ্ড। কেননা, আচম্বিতে ওকে তুহাতে জাপটে তুগাল চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিল কলম্বো।

"আরে, আরে করছেন কি মশাই", পরিত্রাহি ডাক ছাড়ল বণ্ড।

অট্টহেসে আকাশ পর্যন্ত বুঝি কাঁপিয়ে দিল কলম্বো,—"ওরে আমার শান্তশিষ্ট ইংলিশম্যানরে! ডাকাবুকো ডানপিটে! ডরান না কাউকে, ভয় শুধু আবেগকে। কিন্তু আমি" বলেই ধাঁই করে বুকে তুরমুশ পেটা ঘুসি মারল—"এনরিকো কলম্বো—প্রেমে পড়েছি আপনার। ঢাক পিটে বলব সবাইকে—লজ্জা কিসের? বুক আমার দশ হাত। আরে মশাই, আপনি যদি ঐ ব্যাটা মেশিনগানারকে না

খতম করতেন তাহলে রক্তগঙ্গা বয়ে যেত এতক্ষণে। কাউকে জ্যান্ত ফিরতে হত না। আপনি থাকায় মরেছে শুধু দুজন, চোট খেয়েছে বাকী প্রত্যেকেই। কিন্তু অ্যালবেনিয়ান ব্যাটারা সব পটল তুলেছে —ছ'জন ছাড়া। ছজনেই চোঁ চোঁ দৌড় দিয়েছে গাঁয়েরদিকে। পালিয়ে যাবে কোথায়, সেখানেও পুলিশ ওৎ পেতে আছে। ক্রিস্ট্যাটোস বাস্টার্ডকেও মোটর সমেত যমের দক্ষিণ দুয়োর দেখিয়ে দিয়েছেন আপনি। আহারে! সে কি গুলির বহর! দেখবার মত! মেন রোডে পড়লে চলন্ত মোটরের হালটা কি দাঁড়াবে তাই ভাবছি। হাত দেখিয়েছে তো ডান দিকে, মরেও যেন সে খেয়াল থাকে। বাঁ হাতের কারবার বড়ই সর্বনাশা কিনা!" সোল্লাসে বণ্ডের কাঁধে থাপ্পড় মারল কলম্বো।

"মাই ফ্রেণ্ড, এবার কেটে পড়ার পালা। অ্যালবেনিয়ান জাহাজের সবকটা কল খুলে দিয়েছি। হু হু করে জল ঢুকছে। তলিয়ে যাবে এখুনি। এ অঞ্চলে টেলিফোন কোথাও নেই। পুলিশ খবর পেতে পেতেই আমরা লম্বা দেব। খবর তো দেবে জেলের দল। ওদের মোড়লকে টিপে দিয়েছি। অ্যালবেনিয়ানদের চক্ষে দেখতে পারে ওরা। কাজেই আমরা পগারপার হব নির্বিঘ্নে।"

বিধ্বস্ত গুদোম ঘরের ফাঁক ফোকর দিয়ে লেলিহান অগ্নিশিখা সবে দেখা দিয়েছে। সুমিষ্ট উদ্ভিজ্জ পোড়ার কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আসছে আকাশ। জেটিতে ফিরে এল কলম্বো আর বণ্ড। অ্যালবেনিয়ান জাহাজ তলিয়ে গেছে—জল ছল ছল করছে ডেকের ওপর। হাঁটুজল ভেঙে সেই ডেক পেরিয়ে 'কলম্বিনায়' গিয়ে উঠল দুই মূর্তি। সেখানেও বিস্তর করমর্দন আর পিঠে থাবড়া সইল বণ্ড। ইঞ্জিন চালু হল সঙ্গে সঙ্গে। কিছুদূর যেতে না যেতেই পাহাড়ের গায়ে একদল জেলেকে দেখা গেল। কলম্বো ইটালীয়ান ভাষায় কি যেন বলল তাদের। সঙ্গে সঙ্গে ওরা হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

একজনের মন্তব্য শুনে হাসির হররা ছুটল গোটা জাহাজে। হাসতে হাসতে কলম্বো বণ্ডকে বলল—"ওরা আমাদের আবার আসতে বলছে। কেননা অ্যানকোনার সিনেমার চাইতে আমরা নাকি জমাটি খেল দেখিয়ে গেলাম।"

হঠাৎ নিজেকে বড় নোংরা মনে হল বণ্ডের। উত্তেজনাও যেন উধাও হল রক্ত থেকে। নীচে গিয়ে দাড়ি কামাল ধার করা ব্লেডে, সার্ট পালটালো ধার করা সার্ট পরে। পোর্টহোল খুলে দিয়ে দেখল সবুজ উপকূল আর নীল সমুদ্র। রিভলবারের পোড়া বারুদের গন্ধে কিন্তু তখনও জিংঘাসা, মৃত্যু আর আতংকের স্মৃতি।

সেলুনে গেল বণ্ড। দেখল পর্বত প্রমাণ ডিমভাজা, মাংসের চপ, কফি আর রাম নিয়ে জবর খ্যাঁট শুরু করেছে কলম্বো। বণ্ডকে দেখেই মুখভর্তি টোস্ট চিবোতে চিবোতে বলল—"হে বন্ধু, অ্যাদ্দিনে কিস্তিমাৎ করা গেল। গুদোমভর্তি কত আফিং পুড়ল জানেন? পুরো একবছরের সাপ্লাই। কাঁচা আফিং এখান থেকে যেত নেপলসে ক্রিস্ট্যাটোসের কেমিক্যাল কারখানায়। ক্রিস্ট্যাটোস মিথ্যে বলে নি। কারখানা আমারও আছে মিলানে। মাল পাচারের সুবিধের জন্যই এ কারখানা। কিন্তু মারাত্মক কিছুই বানাই না—ক্যাসকারা আর অ্যাসপিরিন কি সমাজের সর্বনাশ করে? মিলানের কারখানা আমারই। বাদবাকী যা কিছু বলেছে ক্রিস্ট্যাটোস, সবই নিজের কীর্তি চালিয়েছে আমার নামে। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়েছে। ক্রিস্ট্যাটোসই কাঁচা আফিং থেকে হিরোইন বানিয়ে চ্যালা চামুণ্ডাদের দিয়ে লণ্ডনে চালান দেয়—আমি নই। জাহাজভর্তি পাহাড় প্রমাণ কাঁচা আফিংয়ের দাম কমসে কম দশলাখ পাউণ্ড। অর্থাৎ মাল বিক্রি হয়ে গেলেই ক্রিস্ট্যাটোস পাচ্ছে দশলাখ পাউণ্ড। মাই ডিয়ার জেমস, আসল ব্যাপারটা তাহলে বলি আপনাকে। দশলাখ পাউণ্ডের মাল কিনতে একটা কানাকড়িও খরচ করতে হয়নি

ক্রিস্ট্যাটোসকে। কেন জানেন? উপহার, রাশিয়ার উপহার। পুরো মালটা রাশিয়া ওকে প্রেজেন্ট করেছে ইংল্যাণ্ডের সর্বনাশ করার জন্যে। মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্রের সামিল এই জাহাজভর্তি আফিং ছড়িয়ে দেওয়া হবে ইংল্যাণ্ডের ঘরে ঘরে। নেশায় বুঁদ করে সর্বনাশ করা হবে তরুণ সমাজের। আফিংএর অভাব নেই রাশিয়ার। জাহাজভর্তি যত চান, পাবেন। দিয়েও ওদের ভাঁড়ার ফুরোবে না। ক্ষেপনাস্ত্রের জন্য আফিং চাষ হচ্ছে ককেসাস অঞ্চলে। অ্যালবেনিয়া ওদের বড় ঘাঁটি। আফিংয়ের অভাব নেই—অভাব শুধু ক্ষেপনাস্ত্রটিকে ইংল্যাণ্ডের বুকে নিয়ে ফেলার উপযুক্ত লোকবল, যোগাড়যন্ত্র ইত্যাদি। ক্রিস্ট্যাটোস ওদের সেই অভাব পূর্ণ করেছে। আফিং-ক্ষেপনাস্ত্রকে সুকৌশলে নিয়ে গিয়ে ফেলছে ইংল্যাণ্ডে। রাশিয়া তার মনিব। মনিবের হুকুম মতই ট্রিগার টেপে আফিং-ক্ষেপনাস্ত্রের। আজ মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে গোটা ষড়যন্ত্রটাকে নাশ করলাম আমরা আপনার সঙ্গে হাত মিলিয়ে। নিশ্চিন্ত মনে দেশে ফিরতে পারেন এখন। গিয়ে বলতে পারেন, আফিং চালান আজ থেকে বন্ধ হয়ে গেল। হক কথাটাও বলবেন আশাকরি। বলবেন, দুই দেশের লড়াইয়ে ভয়ংকর এই চোরাই হাতিয়ারের উৎক্ষেপণ কেন্দ্র কিন্তু ইটালী নয়। আমাদের পরম শত্রু রাশিয়া রয়েছে সব কিছুর মূলে। ওদেরই গুপ্তচর দফতরের অভিনব রণকৌশল—মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের আশ্চর্য অস্ত্র এই আফিং চালান। বিনাপয়সায় হিরোইন বিতরণ। অবশ্য এটা আমার অনুমান। আসল ব্যাপারটা জানবার জন্যে হয়ত আপনাকেই পাঠানো হবে মস্কোতে। ভায়া জেমস, সে সুদিন যদি আসে, তাহলে ভগবান করুন যেন আপনার প্রিয় বান্ধবী লিল বমের মত সুরূপা একটা সঙ্গিনীও জুটে যায়। তাহলেই দেখবেন গোপন রহস্য আপনা হতেই এসে ধরা দিচ্ছে মুঠোয়।"

"তার মানে? লিল বম 'আমার বান্ধবী' হতে যাবে কেন? ও তো আপনার।"

প্রবলবেগে মাথা নাড়াতে নাড়তে কলম্বো বললে—"ভায়া জেমস, বান্ধবী আমার বিস্তর। ইটালীতে তো আপনাকে এখন দিন কয়েক থাকতেই হবে। রিপোর্ট লিখতে হবে," খুক খুক হাসি হেসে—"আমি যা বললাম, তা বাজিয়ে দেখতেও হবে তো। আমেরিকান ইনটেলিজেন্সে গিয়ে দোস্তদের সঙ্গেও আধঘণ্টা নিশ্চয় কাটাবেন জীবন কাহিনী শোনাতে। ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গী তো চাই, নইলে আমার এমন সুন্দর দেশের সৌন্দর্য কে দেখাবে আপনাকে? অসভ্য দেশে গৃহস্বামীরা অনেক বউয়ের মধ্যে থেকে একটা বউকে বেছে নিয়ে সম্মানীয় অতিথিকে দেয় আপ্যায়ণের জন্যে। আমিও অসভ্য। আমার বউ নেই, কিন্তু লিল বমের মত বান্ধবী আছে বিস্তর। লিল বম বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী। আমার নির্দেশের দরকার হবে না। আপনার পথ চেয়েই বসে রয়েছে হয় তো।" পকেট থেকে একটা বস্তু বার করে ঠন্ করে টেবিলে ফেলল কলম্বো। বুকে হাত রেখে বলল সিরিয়াস চোখে—"অন্তর থেকে দিলাম। জানি, লিল বমের অন্তরও সায় দেবে।"

বস্তুটা তুলে নিল বণ্ড। ভারী ধাতুর পাতে লাগানো একটা চাবী। পাতে খোদাই করা হোটেলের নাম আর ঘরের নম্বর:

'অ্যালবার্গো ড্যানিয়েলি। রুম ৬৮'

৩

কোয়ানটাম অভ সোলেস—সান্তনার পরিমাণ

জেমস বণ্ড বললে—"বিয়ে যদি করি তো করব এয়ার-হোসটেসকে, এই আমার বরাবরের ইচ্ছে।"

ডিনার পার্টি শেষ হতে চলেছে। রাত তখন সাড়ে নটা। অন্য তুই অভ্যাগতকে প্লেন ধরিয়ে দিতে গেছে গভর্ণরের এ. ডি. সি। সুসজ্জিত ড্রইংরুমের আরামকেদারায় বসেছিলেন গভর্ণর আর বণ্ড। বসে মোটেই আরাম পাচ্ছিল না বেচারী বণ্ড। মনে মনে পছন্দ হাতলঅলা শক্ত কুশনের চেয়ার—এমন চেয়ার যাতে বসলে মাটিতে পা ঠেকে থাকবে। নরম সোফায় বসে তাই যুত হচ্ছিল না মোটেই।

ন্যাসো জায়গাটাও মোটেই মনে ধরেনি বণ্ডের। এ তল্লাটে বড়-লোক ছাড়া যেন কেউ থাকে না। শীতকালে যারা বেড়াতে আসে, তারাও নিজেদের টাকার পাহাড়, অসুখ-বিসুখ আর চাকরবাকরের সমস্যা ছাড়া আলোচনাই করে না। জমিয়ে আড্ডা মারতে জানে না কেউ। যে তুজনকে এই মাত্র এ. ডি. সি প্লেনে চড়িয়ে দিতে গেল, তারাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। মিস্টার এবং মিসেস হার্ভে মিলার টাকার কুমীর। নিবাস কানাডায়। বউটা খুব সম্ভব ইংরেজ মেয়ে। কিন্তু এত বকবক করে যে কান ঝালাপালা করে দেয়। থিয়েটার নিয়ে বণ্ডের কাছে আলোচনা করতে গিয়ে নিজেই বেকুব বনেছে। কেননা, তু'বছর হল থিয়েটারের মঞ্চ চোখেও দেখেনি বণ্ড। একবারই গিয়েছিল। তাও একজনের পিছু নিয়ে। 'ফলো' করতে গিয়ে থিয়েটার দেখতে হয়েছিল।

বণ্ডের অনুমান বেরসিক এই দম্পতীকে সঙ্গদান করার জন্যেই বণ্ডকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন গভর্ণর—নেহাৎই কর্তব্য। সাতদিনও হয়নি এ অঞ্চলে এসেছে বণ্ড। রুটিনমাফিক কাজ। কিউবাতে ক্যাসট্রো বিদ্রোহীদের কাছে গোলাবারুদের এন্তার চোরাই চালান যাচ্ছে আশপাশের রাষ্ট্র থেকে। আমেরিকা দু'জাহাজ হাতিয়ার ধরে ফেলতেই ক্যাসট্রোর সমর্থকরা ঘাঁটি নিয়েছে জ্যামাইকা আর বাহামায়। বণ্ডের ওপর ভার পড়েছিল এ ঘাঁটিও ভেঙে দেওয়ার। ধড়পাকড়ের ধার দিয়েও যায় নি ও। রাতের আঁধারে দু'জাহাজ হাতিয়ার পাচার বন্ধ করেছে অভিনব উপায়ে। পুলিশ লঞ্চে চেপে জাহাজে পৌঁছেছে। অন্ধকারে গা মিশিয়ে ডেকে উঠেছে। প্রতিটি খোলা পোর্টহোলের মধ্যে দিয়ে এক একটা থারমাইট বোমা ফেলে নিমেষে চম্পট দিয়েছে। দূর থেকে দেখা গেছে জলের ওপর অগ্নিদেবের প্রলয়নৃত্য। 'এম'-এর হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে বণ্ড, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে।

গভীর রাতের প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের হোতা যে জেমস বণ্ড স্বয়ং, এ তথ্য পুলিশ চীফ আর সঙ্গী দুজন অফিসার ছাড়া কেউ জানে না। এমন কি গভর্ণরকেও কিছু বলা হয়নি। ভদ্রলোক শান্তিকামী মানুষ —অশান্তি দিয়ে অশান্তি নিবারণের পন্থায় বিশ্বাসী নন। এই কারণেই বণ্ডকেও তার মনে ধরেনি মোটেই। বণ্ডের সঙ্গে প্রথম করমর্দনের মধ্যেই বিতৃষ্ণাটা প্রকাশ করে ফেলেছেন। যে যাই বলুক বণ্ডের মত বিপজ্জনক লোকের সঙ্গে মাখামাখি করে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটা তো নষ্ট করতে পারেন না গভর্ণর।

কাজেই ভিজে ভিজে আসরকে একাই মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল গভর্ণরের এ.ডি.সি। ডিনার শেষে বিরক্তিকর হার্ভে মিলার দম্পতীকে এয়ার পোর্টেও নিয়ে গেছে। ঠিক তখন কথায় কথায় বণ্ড বলে ফেলেছিল বউ করলে এয়ার হোস্টেসকেই বউ করা উচিত।

উড়োজাহাজের এই সেবিকা মেয়েরা নাকি যাত্রীদের বড়ই আদর যত্ন করে। আসলে, বিয়ে করে গোলাম হওয়ার কোনো ইচ্ছাই নেই বণ্ডের। কফি এবং মদ্যপান শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছুটি নেই। তাই সময় কাটানোর জন্যই এয়ার হোসটেস প্রসঙ্গ এনেছিল বণ্ড।

গভর্ণর চুরুটে ফের আগুন দিলেন, বললেন—"আপনার মতই এয়ার-হোসটেস পাগল হয়েছিলেন ভদ্রলোক। সে কাহিনী শুনলে মন কাঁদে। শুনতে চান তো বলতে পারি।"

গভর্ণরকে কথা বলানোর সুযোগ পেয়ে লুফে নিল বণ্ড। সোৎসাহে বললে—"নিশ্চয়, বলুন না।" বলে আর এক পেগ ব্র্যাণ্ডি নেবার আছিলায় সোফা ছেড়ে গিয়ে বসল হাতলঅলা উঁচু চেয়ারে।

চুরুটের নীলচে ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন গভর্ণর।

"ধরুন তার নাম মাস্টার্স, ফিলিপ মাস্টার্স। কর্মজীবনে বলতে গেলে আমার সমসাময়িক। একবছরের সিনিয়র ছিলাম আমি। অক্সফোর্ডে স্কলারশিপ নিয়ে পড়েছে। তারপর দরখাস্ত করেছে কলোনীয়াল সার্ভিসে চাকরীর জন্যে। খুব একটা ধূর্ত না হলেও প্রচণ্ড খাটতে পারত ফিলিপ। কথাবার্তায় মনে দাগ রাখত। কাজেই ইণ্টারভিউ বোর্ডে মনোনীত হল ও। প্রথমেই যেতে হল নাইজি-রিয়ায়। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে গলাগলি বন্ধুত্ব হল দুদিনেই। নাইজেরিয়ার লোকদেরও আপনজনের মত দেখেছিল বলে ভাল-বাসাও পেয়েছিল। স্থানীয় লোকদের এত কাছে টেনে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল ওর মনের একটা বিচিত্র গঠনের জন্যে। ঐ বয়েসের ছেলেরা হয় মেয়ে-পাগল। ফিলিপ কিন্তু হল নাইজেরিয়াবাসী পাগল। সমাজের মেয়েদের দিকে কোনো নজরই ছিল না ওর। এমনিতেই মুখচোরা। নিজে আগুয়ান হয়ে মেয়ে পটানোর বিদ্যেতে নেহাতই নাবালক। পড়াশুনার ফাঁকে সময়ও পায়নি, চাকরীতে

ঢুকেও সেই হাল হল। অর্থাৎ আকর্ষণটা মেয়েদের দিকে না গিয়ে গেল স্থানীয় বাসিন্দাদের দিকে।”

বণ্ড বলল—“আফ্রিকার মেয়েদের আবার বার্থ কনট্রোলে বড় অরুচি। সেদিকে আশা করি হুঁশিয়ার হয়েছিল ফিলিপ মাস্টার্স।”

বণ্ডের পার্থিব ভাবনায় ব্যাজার হলেন গভর্ণর। মুখে বললেন—“যৌনতত্ত্ব নিয়ে কিন্তু এ গল্প আমি ফাঁদিনি। কাফ্রি মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করার কথা কোনোদিন কল্পনাই করেনি ফিলিপ। জোয়ান ছেলেদের মধ্যে যৌন অজ্ঞতা আজকাল হামেশা দেখা যাচ্ছে ইংলণ্ডে। সে আমলেও একরম ছেলে দেখা যেত। যেমন ফিলিপ মাস্টার্স। শরীর মনে নিখুঁত পুরুষ, সুসভ্য নাগরিক। অথচ মেয়ে-পাগল নয় মোটেই।”

ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিল বণ্ড। গল্পটা জমেছে ভাল।

গভর্ণর বললেন—“নাইজেরিয়ার প্রথম শ্রমিক সরকারের আমলেই ফিলিপের চাকরী শুরু। লেবার গভর্নমেণ্ট প্রথমেই পররাষ্ট্র নিয়ে ভাবতে বসে। ফলে, নয়া গভর্ণর আসে নাইজেরিয়াতে। অধিবাসীদের প্রগতি চিন্তার আরম্ভেই গভর্ণর অবাক হলেন ফিলিপকে দেখে। ছোকরা সরকারী পলিসির তোয়াক্কা না রেখে বহু আগে থেকেই স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে জমিয়ে বসেছে। খুব উৎসাহ দিতে লাগলেন গভর্ণর। উঁচু পদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভারও দিলেন। ফিলিপের বদলির সময় হতেই এমন উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রশস্তি দিয়ে সুপারিশ করলেন যে এক ধাক্কাতেই ডবল প্রমোশন হয়ে গেল। ফিলিপ বারমুডায় বদলি হল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর পোস্টে।

“বারমুডায় আমারই সহকারী হয়ে এল ফিলিপ। কিন্তু বারমুডা পৌঁছোনোর আগের কাহিনীটা আগেই বলে নিই। নাইজেরিয়া থেকে লম্বা ছুটি নিয়ে আকাশ পথে লণ্ডন এল ফিলিপ। নাইরোবি

থেকে ইম্পিরীয়াল এয়ারওয়েজ—বি.ও.এ.সি-র আগের প্লেন ব্যবস্থা। ফিলিপের সেই প্রথম আকাশ যাত্রা। মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠার সময়ে একটু ভয়-ভয় করেছিল। এয়ার হোসটেস একটা লজেন্স দিয়েছিল মুখে রাখতে। সিট-বেল্টটাও এঁটে দিয়ে গিয়েছিল। তেমন বেশী যাত্রী ছিল না প্লেনে। একটু পরেই এয়ার-হোসটেস ফিরে এল। মিষ্টি হেসে বললে—'এবার খুলতে পারেন বেল্ট'।

"কিন্তু বেল্ট খুলতে গিয়ে চোখ মুখ লাল করে ফেলল ফিলিপ। মেয়েটির মিষ্টি রূপ দেখে প্রথম থেকেই মজেছিল বেচারা। অথচ যেচে আলাপ জমাবার সাহস নেই। অবস্থা দেখে মেয়েটি নিজেই হেঁট খুলে দিল বেল্ট। জীবনে এত কাছে কোনো যুবতীকে পায়নি ফিলিপ। ফলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হল আরক্ত মুখে। মেয়েটি তাই দেখে মোহিনী হাসি হেসে বসল চেয়ারের হাতলে। জিজ্ঞেস করল কদ্দুর যাওয়া হচ্ছে, কোত্থেকে আসা হচ্ছে। দেখতে দেখতে আলাপ জমিয়ে ফেলল এয়ার-হোসটেস। প্রায় সমবয়েসী এমন রূপসী চেহারার মেয়ের সঙ্গে এত সহজভাবে আলাপ করা যায় দেখে ফিলিপ নিজেই অবাক হল। আফ্রিকা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনতে চাইল মেয়েটি। ফিলিপকে উপলব্ধি করিয়ে ছাড়ল যে ফিলিপ সামান্য লোক নয়।

"ফলে, নীচের মেঘমালার দিকে তাকিয়ে উন্মনা হল ফিলিপ। এরকম নিখুঁত রূপ বড় একটা দেখা যায় না। নাতিদীর্ঘ তনু সুঠাম সুগঠিত। দুধে-গোলাপে মেশানো রঙ। ঝিকিমিকি চুল ছিমছাম কায়দায় উঁচু করে বাঁধা। চেরী ফলের মত টুকটুকে রাঙা হাসি-হাসি অধর। নীল নীল চোখে কৌতুকোজ্জ্বল দুষ্টুমি। নাম, রোডা লোয়োলিন।

"রোডাকে নিয়ে আকাশ পাতাল কল্পনায় মত্ত হল ফিলিপ। মুখ-চোরা ছেলেমাত্রই প্রেমে পড়লে স্বপ্নসৌধ রচনা করে মনে মনে।

ডিনারে নেমন্তন করলে বা একসঙ্গে থিয়েটার দেখতে চাইলে রোডা মুখ বেঁকিয়ে না বলে বসবে না তো? এখনো দুটো দিনতো রোডার সঙ্গে কাটাতে হবে, তারপর? তারপর কি আর দেখা হবে? রোডার সাহচর্যের প্রত্যাশী নিশ্চয়ই অনেকেই। রোডা কি বিবাহিতা?

"দুপুরের খাবার নিয়ে এল রোডা। ট্রে-টা দুই হাঁটুর ওপর রাখতে গিয়ে চুলের ঘসটা লাগল ফিলিপের গালে। সেলোফেনের মোড়ক খুলে খুলে কিভাবে খেতে হয়, দেখিয়ে দিল রোডা। কিভাবে স্যালাড ড্রেসিং-এর প্লাস্টিক ঢাকনি খুলতে হয়, তাও বুঝিয়ে দিল। সংক্ষেপে, ফিলিপকে নিয়ে এমন কাণ্ড করল যেন সে কচি খোকা, কিস্সু জানেনা।

"আকাশ-যাত্রা শেষ হলে ঘামতে ঘামতে ডিনার খাওয়ার নেমন্তন্ন জানালো ফিলিপ। ভেবেছিল হাসতে হাসতেই তা প্রত্যাখান করবে রোডা। কিন্তু কি সাংঘাতিক অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স। এক কথাতেই রাজী হয়ে গেল রোডা। একমাস পরেই ছাড়ল ইম্পিরীয়াল এয়ার-ওয়েজের চাকরী। বিয়ে হয়ে গেল দুজনের। তারও এক মাস পরে ছুটি ফুরোতে বারমুডা রওনা হল ফিলিপ।"

এই পর্যন্ত শুনে বণ্ড বলল—"আমার তো মনে হয় যে স্রেফ লোভে পড়ে ফিলিপ মাস্টার্সকে বিয়ে করেছিল রোডা। সমাজের উঁচু মহলে ওঠার লোভ, গভর্ণরের টি-পার্টিতে রূপ দেখানোর আকাঙ্ক্ষা। গল্পের শেষে নিশ্চয় দেখা যাবে, বউ হত্যা করেছে মাস্টার্স, তাই না?"

"না", বললেন গভর্ণর, "তবে ধরেছেন ঠিকই। উদ্দেশ্য নিয়েই ফিলিপকে বিয়ে করেছিল রোডা। আকাশে ওড়ার চাকরীতে বিপদ অনেক, ঝুঁকি অনেক। খুব সম্ভব সেই কারণেই চাকরী-জীবনে ইতি দিয়ে ঘর সংসারে মন দিল রোডা। বারমুডা এসে হ্যামিল্টনের উপকণ্ঠে বাংলো নিল। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। বিশেষ করে

রোডার। তার প্রাণোচ্ছলতা, তার মিষ্টি মুখের কথায় বশ মানল সবাই। মাস্টার্স নিজেও যেন পালটে গেল। দেখে দুঃখ হত। বউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে হিমসিম খেত বেচারী। জামাকাপড় ঝকঝকে রাখা, চুল চকচকে রাখা, সামরিক গোঁফ রেখে তাগড়াই চেহারা বানানো, ইত্যাদি বহুবিধ কষ্টকর ব্যাপার নিয়ে অষ্টপ্রহর সে কি প্রাণান্ত পরিশ্রম!

"ছ'মাস মহানন্দে কাটালো দুজনে। ওদের সুখ সবাইকেই সুখী করল। তারপর থেকেই শুরু হল গিন্নীর গজগজানি। ককটেল পার্টি ফের কবে হবে? অমুকের স্ত্রী মার্কেটে যাবার সময়ে তাকে নিয়ে যায় না কেন? আর একটা প্রোমোশন না হওয়া পর্যন্ত বাচ্ছা হলে মানুষ করার সঙ্গতি কোথায়? সারাদিন একা-একা আর ভাল্লাগে না, ইত্যাদি। তারপর শোনা গেল, বউ-এর মন জোগাতে হামেহাল মেহনৎ করছে ফিলিপ। সকালে উঠে বউকে প্রাতরাশ এনে দেওয়া থেকে শুরু করে বিকেলে বাড়ী ফিরে ঘর বোঝাই সিগারেটের ছাই আর চকোলেটের মোড়ক পরিষ্কার—কিছুই বাদ রাখছে না। এমন কি সিগারেট আর মদ খাওয়াও ছেড়ে দিল ফিলিপ। সাধু কারণে নয়—বউয়ের দামী পোশাকের পয়সা জোগাতে—নইলে অমুকের বউয়ের কাছে মান থাকছে না এয়ার হোসটেসের। কি করে যে বউকে খুশী করবে, দিনরাত তাই ভাবত ফিলিপ। শেষে ধরল গল্‌ফ্। ডুবল এইতেই।

"গল্‌ফ্ খেলা শিখতে আরম্ভ করল রোডা। শেখায় ত্রুটি রইল না। ঘর্মাক্ত কলেবরে রোডার প্র্যাকটিসের বহর দেখে স্বয়ং গভর্ণরও তারিফ করলেন বহুবার। তারপর এল একটা কমপিটিশন। রোডার জুটি হল যে, নাম তার ট্যাটারসাল। বয়েসে ছোকরা। বড় লোকের ছেলে। দেখতে ময়ূরছাড়া কার্তিকের মত। ভাল সাঁতারু। বজরা আর স্পীডবোটের মালিক। কাজেই বান্ধবীর অভাব নেই। এক

শয্যায় চটপট না শুতে দিলে কোনো মেয়েকেই বজরা, স্পীডবোট বা নাইট ক্লাবে নিয়ে যায় না। কাজেই কি চরিত্র বুঝতেই পারছেন।

"রোডা আর ট্যাটারসাল বিস্তর খেটে জয়ী হল প্রতিযোগিতায়। আহ্লাদে আটখানা হয়ে বউকে অভিনন্দন জানাল ফিলিপ। জীবনে সেই শেষ অভিনন্দন জানানো হল গিন্নীকে—কেননা পরের দিন থেকে ট্যাটারসাল ছোকরার সঙ্গে উড়তে আরম্ভ করল রোডা।

"রেখে ঢেকে নয়, খোলাখুলি ট্যাটারসালের সঙ্গে শুরু হল ব্যাভিচার। নিষ্ঠুর আঘাতের পর আঘাত দিয়ে চলল গোবেচারা স্বামীকে—দগদগে ঘায়ের ওপর পরের পর খোঁচা মারতে তিলমাত্র দ্বিধা করল না রোডা। এমন কি ছল ছুতোয় শোবার ঘরও আলাদা করে নিল—কারণ ফিরতে তো প্রায়ই রাত হয়। গিন্নীর জন্যে রাত জেগে বসে না থেকে আলাদা ঘরে ঘুমিয়ে পড়লেই পারে ফিলিপ।

"ঢি-ঢি পড়ল সমাজে এক মাসের মধ্যেই। কেলেংকারী চরমে ওঠার আগেই গভর্ণরের স্ত্রী নিজে একদিন রোডাকে বোঝালেন। ফিলিপকেও শক্ত হতে বললেন। বাড়ীতে ঝগড়া, কান্না রোজ রাতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। বউকে এক রাতে প্রায় গলা টিপেই মারতে গেল ফিলিপ। তার যে মুখে স্বর্গের সুখ ভাসত, বারমুডায় আসার বছর খানেকের মধ্যেই সে মুখে নরকের ছায়া দেখলাম। ফিলিপ বন্ধুবান্ধব কাউকে এ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে দিত না—বলতে গেলেই খেঁকিয়ে উঠত জখমা কুত্তার মত। একদিন ষড় করে আমরা মদ গেলালাম। কলতলায় গেল ফিলিপ। তারপরেই—ধড়াম করে কি যেন আছড়ে পড়ল। শুনেই দৌড়োলাম। দেখলাম, ক্ষুর দিয়ে কব্জির ধমনী কাটবার চেষ্টা করেছে ফিলিপ।

"আত্মহত্যার সেই প্রচেষ্টার পর সত্যিই আমরা ভয় পেলাম। গভর্ণরকে ধরলাম। তিনি বললেন, ফিলিপের চাকরীই থাকে কিনা সন্দেহ। কাজকর্ম তো গোল্লায় গেছে। সমাজেও তার বউ কেলেং-

কারী করে বেড়াচ্ছে। যাক, অনেক ধরাধরি করে ফিলিপকে ওয়াশিংটনে পাঠানো হল মাস পাঁচেকের মেয়াদে নতুন কাজের ভার দিয়ে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম সবাই। রোডা মাস্টার্সের ব্যভিচার নিয়েও মাথা ঘামানো বন্ধ করলাম।"

রুমাল বার করে কপাল মুছলেন গভর্ণর। হুইস্কি ঢেলে নিজে গলায় ঢাললেন, বণ্ডকেও দিলেন। দেখা গেল, স্মৃতির রোমন্থন করতে গিয়ে বিলক্ষণ উত্তেজিত হয়েছেন তিনি। মুখ লাল হয়েছে, চোখেও চকমকির ঝিকিমিকি দেখা দিয়েছে।

বণ্ড বলল—"ভারী নষ্ট মেয়ে তো। পাকা বেশ্যা। পরে অনুতাপ জেগেছিল নিশ্চয় ?"

নতুন একটা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে গভর্ণর বললেন—"না। অনুতাপের অবকাশ ছিল না। সময় ভালই কাটছিল। তাল গাছের ছায়ায় বালিতে শুয়ে কেলি করা থেকে আরম্ভ করে স্পীডবোটে চেপে মাঝ দরিয়ায় গিয়ে রোমান্স করা—সবই তো হচ্ছিল। বেশীদিন এ আনন্দ নাও টিকতে পারে। রোডা কি তা জানত না ? নিশ্চয় জানত। এ কথাও জানত যে সে-সময় এলে ফিলিপের কাছে দুফোঁটা জল ফেলে নাকি সুরে কেঁদে ক্ষমা চেয়ে নিলেই হবে'খন। এখন তো মজা করে নেওয়া যাক। বাকী সময়টুকু কাটাবার জন্যে, দুদণ্ড ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্যে, জামা কাপড় পালটানোর জন্যে স্বামীর বাংলো তো রইলই। ফিলিপ যদি বেঁকে দাঁড়ায় তো স্বামীর অভাব হবে না। আরো চটকদার স্বামী তুড়ি মারলেই পাওয়া যাবে গলফ ক্লাবে।

"রোডার এই অহংকারকে যাচাই করার জন্যেই যেন ট্যাটারসাল এবার সরে দাঁড়াল। গভর্ণর আর তাঁর স্ত্রী ছোকরার বাপ-মাকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে, তাঁরা উঠতে বসতে মানা করতে লাগল ছেলেকে। কেলেংকারীর কেচ্ছায় যে কানপাতা দায় ! ট্যাটারসালও দেখলো, গরমের ছুটি কাটাতে মার্কিন সুন্দরীরা আসছে

দ্বীপে। এ সময়ে একটু মুখ না বদলালে মেজাজ আসছে না। রোডাকে অছিলা দেখালো। বাবা হাত খরচ বন্ধ করে দেবে ভয় দেখিয়েছে। কাজেই আজ থেকে মেলামেশা বন্ধ। রোডা টুঁ শব্দটি করল না। ও তো জানত, এ ঘটনা একদিন না একদিন ঘটবেই। ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে এল গভর্ণরের বউয়ের কাছে। কথা দিল এবার থেকে ফের ঘর সংসারে মন দেবে। ফিলিপকে সুখী করবে। বাড়ী বসে রোজ মহড়া দিতে লাগল। ফিলিপ ওয়াশিংটন থেকে দিন পনেরো পরে ফিরলেই কি ভাবে অনুতাপের কান্না কাঁদতে হবে, কি কি সাজানো কথা বলতে হবে, এয়ার হোসটেস সুলভ মিছরী ভিজোনো গলায় সোহাগ চাইবে, আবার জোড়া বিছানা পাতবে, ইত্যাদী।

"ফিলিপ মাস্টার্স বাড়ী ফিরল সেই সময়ে।"

থামলেন গভর্ণর। তারপর বললেন—"আপনি বিয়ে করেন নি। সব নর, সব নারীর মধ্যে যোগসূত্র কিন্তু একটা জায়গাতেই ঠেকে আছে। বিবাহিত জীবনে সব অপরাধ ক্ষমা করা যায়, এমন কি খুন করার ক্ষমাও পাওয়া যায়—কিন্তু মনুষ্যত্বের অভাব ঘটলে বিবাহ ভেঙে যায়। কয়েকশ' দম্পতীর ক্ষেত্রে আমি একই কাণ্ড দেখেছি। একজন অসুস্থ না সুস্থ, জীবিত না মৃত, মানবিকতার এই সহজ অনুসন্ধিৎসাও যখন অপর জনের মধ্যে জাগে না, সহজতম মনুষ্যত্বের যখন এই ভাবে মৃত্যু ঘটে, বিবাহ তখন ভাঙতে বাধ্য। অনেক দেখে শুনে আমি এই থিয়োরীর একটা গালভরা নামকরণও করেছি। ল অভ দি কোয়ানটাম অভ সোলেস।"

বণ্ড বলল—"ভারী চমৎকার নাম তো। মনে দাগ রেখে যায়। বলেছেন ঠিক। কোয়ানটাম অভ সোলেস—স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ। বন্ধুত্ব বা প্রেম টিঁকে থাকে শুধু এই আরামের পরিমাণের ওপর। মানুষ এই আছে এই নেই। সেখানে পরস্পরের প্রতি দরদী মনের

অভাব ঘটলেই প্রেম বা বন্ধুত্ব ভঙ্গুর হতে বাধ্য। দরদ যখন শূন্য হয়, মৃত্যুকামনা তার জায়গা নেয়—কোয়ানটাম অভ সোলেস দাঁড়ায় শূন্যের ঘরে।"

গভর্ণর বললেন—"ফিলিপ মাস্টার্স যে মুহূর্তে বাংলোর চৌকাঠ পেরোচ্ছে, সেই মুহূর্তে কেউ তার বউকে হুঁশিয়ার করে দিলে ভাল হত। ওপর ওপর দেখেও কিছু বোঝে নি রোডা। যদিও ফিলিপের সে গোঁফ আর নেই, চুল আবার আগের মতই উস্কখুস্ক। চিবুকের রেখা শক্ত। মুখ নির্বিকার। রোডা সাদাসিধে একটা ফ্রক পরে বই নিয়ে বসেছিল চেয়ারে। এমন ভাবে বসেছিল যাতে আলো অন্ধকারে কোলের ওপর খোলা বইটা দেখা যায়, কিন্তু মুখটা আঁধারে থাকে। ঠিক ছিল, ফিলিপ ঘরে ঢুকলেই বই থেকে চোখ তুলবে রোডা, কিন্তু, আগ বাড়িয়ে কথা বলবে না। যেন সাত চড়েও রা'টি নেই মুখে, এমনি অনুরক্ত বিনীত অনুগত মুখে তাকিয়ে থাকবে। ফিলিপ আগে কথা বলবে। বললেই উঠে দাঁড়াবে রোডা। পায়ে পায়ে গিয়ে সামনে দাঁড়াবে। বাতাসে মাথা ঠুকে স্বাগত জানাবে। একে-একে খুলে বলবে স—ব। বলতে বলতে অঝোরে কাঁদবে। ফিলিপ তখন ওকে বুকে টেনে নেবে। প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাবে রোডা। জীবনেও আর ঘ্যান করব না, ত্যান করব না, পোষা কুকুরটির মত ঘাসে মুখ দিয়ে চলব, ইত্যাদি ইত্যাদি। বহুবার রিহার্স্যাল দিয়ে পুরো দৃশ্যটাকে বেশ দাঁড় করিয়েছিল রোডা।

"হুবহু সেইভাবেই বোবা চোখে বই থেকে মুখ তুলল রোডা। সুটকেশ নামিয়ে রাখল ফিলিপ। নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল ম্যাণ্টল-পিসের সামনে। আনমনা চোখে চাইল রোডার পানে। চাহনিতে আগ্রহের বাষ্পও নেই, আছে কেবল হিমশৈত্য। ঘরোয়া উষ্ণতা নেই। উদাসীন শীতলতা ছাড়া কিছুই নেই চোখে। ভেতর পকেট থেকে এক তা কাগজ বার করে বলল সাদামাটা গলায়—'এবাড়ীর

প্ল্যান— দুভাগ হল বাড়ীর ঘরদোর। তোমার ভাগে রান্নাঘর আর তোমার শোবার ঘর। আমার ভাগে এই ঘর—আর বাড়তি শোবার ঘর। আমি যখন থাকবো না, তখন বাথরুমে যেতে পারো।' কাগজটা রোডার খোলা বইয়ের ওপর ফেলে দিয়ে—'আমার ঘরে কখনো ঢুকবে না। আমার বন্ধুবান্ধব এলে অবশ্য আসবে।' রোডা মাস্টার্স কথা বলতে গেল, কিন্তু ইঙ্গিতে থামিয়ে দিল ফিলিপ। বলল—'প্রাইভেটে তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ কথা। এরপর তুমি কথা বললেও আমি জবাব দেব না। কিছু বলবার থাকলে চিরকুট লিখে কলতলায় রেখে দেবে। ঘড়ি ধরে খাবার দাবার যেন পাই ডাইনিং রুমে। আমার খাওয়া হয়ে গেলে ডাইনিং রুমে তুমি আসতে পারো। ঘরসংসার দেখাশোনার জন্যে মাসে কুড়ি পাউণ্ড তোমায় দেব। এ টাকা পাবে প্রতিমাসের পয়লা তারিখে আমার অ্যাটর্নীর মারফৎ। ডাইভোর্সের কাগজপত্রও তৈরী করছে আমার অ্যাটর্নী। তোমাকে আমি ডাইভোর্স করছি। লড়বার ক্ষমতা তোমার নেই। একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ তোমার বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ সাজিয়ে কেস খাড়া করে দিয়ে গেছে। বারমুডায় আমার মেয়াদ ফুরোবে আর একবছর পরে। আমাদের বিবাহবিচ্ছেদ শুরু হবে তখন থেকেই। এই এক বছর সবার সামনে আমরা স্বাভাবিক স্বামীস্ত্রীর মত অভিনয় করব'।

"কথা শেষ করে পকেটে হাত গুঁজে বিনয়-কোমল চোখে স্ত্রীর পানে চেয়ে রইল ফিলিপ। রোডার দুই চোখে তখন অশ্রুর ধারা নেমেছে। ভয় পেয়েছিল রোডা। হঠাৎ মুখে জুতো মারলে এমনি কান্না আসে। নির্বিকার গলায় ফিলিপ বললে—'যদি বিশেষ কিছু বলবার থাকে, বলতে পারো। নইলে রান্নাঘরে যাও—নিজের বলতে যা কিছু আছে সঙ্গে নিয়ে যাও,' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে—'ডিনার খাব রোজ রাত আটটায়। এখন সাড়ে সাতটা বাজে'।"

থামলেন গভর্ণর। চুমুক দিলেন হুইস্কিতে। বললেন—"রোডা চেষ্টার ক্রটি করেনি। কান্নাকাটি, মিনতি, অনুরোধ—কিছুই কাজে লাগেনি। ফিলিপ পাহাড়ের মত অটল। যেন সে নিজে আসে নি। অন্য কাউকে প্রতিনিধি-স্বরূপ পাঠিয়েছে আবেগহীন গলায় তারই কথা বলতে। শেষকালে রাজী হতেই হল রোডাকে। সঙ্গে কানাকড়িও তো নেই। ইংলণ্ডে ফেরবার জাহাজ ভাড়াও নেই। দুবেলা খাওয়া আর রাত্রে মাথা গোঁজার জন্যে এ প্রস্তাব মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া আর পথ ছিলনা। এত কথা অবশ্য তখন কেউ জানেনি। পরে গভর্ণরের স্ত্রীকে রোডা সব বলে। আমিও ফিলিপের কাছে অনেক খবর পেয়েছিলাম। কিন্তু সে সময়ে ফিলিপ আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। ডুব দিয়েছিল কাজে। আগের মতই তুখোড় কর্মবীর বনে যাওয়ায় খুশী হয়েছিল সবাই। যাক, একটা সুখী দম্পতীর সুখ তাহলে ফিরে এসেছে।

"একবছর দেখতে দেখতে কেটে গেল। ফিলিপের বদলির সময় এল। বহু বিদায় সম্বর্ধনায় স্বামীস্ত্রী হাজির রইল যুগলে। ফিলিপ সবার কাছেই বললে, রোডা জিনিসপত্রের বিলিব্যবস্থা করতে থেকে যাচ্ছে—পরে যাবে। কিন্তু জাহাজে ফিলিপকে উঠিয়ে দিতে রোডা যায়নি দেখে অবাক হয়েছিলাম। ফিলিপ জানালে, শরীর খারাপ, তাই আসেনি। কিন্তু কয়েক হপ্তা যেতে না যেতেই বিবাহ বিচ্ছেদের খবর ইংলণ্ড থেকে এসে পৌঁছোলো বারমুডায়। গভর্ণরের স্ত্রীর কাছে গিয়ে হাউমাউ করে সেই প্রথম সব কথা ফাঁস করল রোডা। ফিলিপের সর্বশেষ মারের ভয়ংকর কাহিনীও বলল ফোঁপাতে ফোঁপাতে।"

হুইস্কিতে ফের চুমুক দিলেন গভর্ণর—"যেদিন বারমুডা ছেড়ে যাচ্ছে ফিলিপ সেই দিনই কলতলায় গিয়ে রোডার লেখা একটা চিরকুট পেয়েছিল সে। এর আগেও কাকুতি মিনতি মাখানো এমনি

অনেক চিরকুট পাওয়া গেছে কলতলায়, ফিলিপ ছিঁড়ে কুচিকুচি করে রেখে দিয়েছে বেসিনের তাকে। সেবার চিরকুটের ওপর লিখে দিল, সন্ধ্যে ছ'টায় বসবার ঘরে এলে দেখা পাওয়া যাবে তার। যথাসময়ে রান্নাঘর থেকে গরুচোরের মত চুপিসাড়ে ঘরে ঢুকল রোডা। আবেগ দিয়ে স্বামীরত্নের মন টলানোর চেষ্টা অনেক আগেই ছেড়েছিল সে। বুঝেছিল দয়াভিক্ষা সে পথে অসম্ভব। তাই এককোণে দাঁড়িয়ে বলল মিনমিনে গলায়। কাছে মাত্র দশ পাউণ্ড রয়েছে। ফিলিপ গেলে খাবে কি?

'আমার দেওয়া জড়োয়া গয়না আর ফার বেচে দিও।'

'খুবজোর পঞ্চাশ পাউণ্ড হবে তাতে।'

'গতর খাটিয়ে রোজগার করো।'

'কাজ খুঁজতে সময় তো লাগবে। থাকবো কোথায়? পনেরো দিনের মধ্যেই এ বাড়ীর বাইরে যেতে হবে। আর কিছুই কি দেবে না? উপোষ করে থাকব আমি?'

যে চোখে তাকাল ফিলিপ, সে চোখে রাগ নেই, বিরাগ নেই, বিদ্বেষ নেই, অনুরাগও নেই। ঠাণ্ডা চাহনি। বলল—'তুমি রূপসী। উপোষ কখনও করতে হবে না।'

'ফিলিপ, একটু দয়া করো। গভর্ণমেণ্ট হাউসে গিয়ে ভিক্ষে করলে কি তোমার মুখোজ্জ্বল হবে?'

"দু চারটে টুকিটাকি জিনিস ছাড়া বাড়ীতে নিজস্ব বলতে কিছুই ছিল না। ফার্নিচার সমেত ভাড়া নেওয়া বাংলো। আগের হপ্তায় বাড়ীঅলা এসে লিস্ট মিলিয়ে নিয়েছে—সব ফার্নিচারই আছে। ফিলিপের নিজস্ব বলতে ছিল শুধু একটা হাত বদল পুরোনো মরিস গাড়ী আর রেডিওগ্রাম। বউয়ের চিত্তবিনোদনের শেষ চেষ্টা এই রেডিওগ্রাম। এইটা কিনে দেওয়ার পরেই গলফ্‌ খেলায় মাতে রোডা।

"গিন্নীর দিকে শেষবারের মত তাকালো ফিলিপ। আর তো দেখা হবে না। বলল—'বেশ, গাড়ী আর রেডিওগ্রামও তোমাকে দিলাম। গুডবাই,' বলে, লম্বা লম্বা পা ফেলে বসবার ঘর ছেড়ে গেল নিজের ঘরে।"

বণ্ডের দিকে তাকালেন গভর্ণর। ঠোঁটে নিগূঢ় হাসি। বললেন —"ভাবছেন, বিদায়কালে উদারতা দেখিয়ে গেল ফিলিপ। তাইনা? শুনুন তাহলে। ফিলিপ বারমুডা ছেড়ে যেতেই রোডা গয়না আর ফার নিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে গেল পুরোনো জিনিসপত্র বেচা-কেনার দোকানে। গয়নার বদলে পেল চল্লিশ পাউণ্ড, ফারের বদলে সাত পাউণ্ড। রগড় হল তার পরেই। গাড়ী নিয়ে বেচতে গিয়ে দেখা গেল, ফিলিপ গাড়ীটা কিনেছে হায়ার পারচেজ চুক্তিতে। অর্থাৎ মাসে মাসে টাকা দিয়ে যাচ্ছে। তাও নাকি বেশ কয়েকমাসের টাকা বাকী পড়েছে। সব মিলিয়ে তো দশ পাউণ্ড হবেই। ফিলিপকে উকিলের চিঠিও দেওয়া হয়েছে। শুনেই তো কান্নায় ভেঙে পড়ল রোডা। গাড়ী বেচা তো দূরের কথা, দুশ পাউণ্ডের দেনার দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে পেট্রোলসমেত গাড়ী ছেড়ে আসতেও সে রাজী। কিন্তু তা নিয়েও তো দুশ পাউণ্ড ওঠে না। কোর্টে মামলা উঠবেই, রোডাকেও কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে ফিলিপের দেনার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে। যাক, অনেক কথা কাটাকাটির পর রেহাই পেল রোডা। গাড়ী ফেলে রেখে দুপুর রোদে বেরোলো রাস্তায়। এবার রেডিওগ্রামের দোকান। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির জন্যে তৈরি ছিল রোডা। ঘটলও তাই। এ বস্তুটিও কেনা হয়েছে দফায় দফায় টাকা দেবার সর্তে। দেনা সেখানেও। অতি কষ্টে সেখানেও একটা রফায় এল রোডা। লোকসানের মধ্যে রেডিওগ্রাম তো গেলই, নগদ দশ পাউণ্ডও খসল। বাড়ী ফিরে সারা দিন মুখ গুঁজড়ে কাঁদল রোডা। দম্ভ তার চূর্ণ হয়েছে। বিদায়কালেও লাথিয়ে গেল ফিলিপ।"

একটু থেমে গভর্ণর বললেন—"মানুষ মানুষকে যত ঘৃণাই করুক, যত অপছন্দই করুক, সান্ত্বনা বা আরাম খানিকটা পেলেই সে সব ভুলে যায়। যার নাম দিয়েছি কোয়াণ্টাম অভ সোলেস, সেই জিনিস খানিকটা ফিলিপকে দিলেই রোডার সাতখুন মাপ করে দিত ফিলিপ। কিন্তু নৃশংস ব্যবহার, নিষ্ঠুর আচরণ, নির্মম ঔদাসীন্য ছাড়া সে কিছুই পায়নি রোডার কাছ থেকে। অন্তর কতখানি বিষিয়ে গেল ফিলিপের মত শান্তস্বভাবের ক্ষমাশীল মানুষ অতটা নির্মম হতে পারে, তা কল্পনা করে নিন। পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার চরমতম নমুনা হল দেনাসমেত রেডিওগ্রাম আর গাড়ীটা রোডাকে দিয়ে যাওয়া। কি নারকীয় পরি-কল্পনা! ফিলিপ যখন নেই, তখনও যাতে ফিলিপের ঘৃণা রোডাকে দগ্ধে দগ্ধে মারে, তার সুচারু ব্যবস্থা। চলে গিয়েও ফেলে লাথি মারার কি নিখুঁত ফন্দি!"

বণ্ড শুধু বলল—"ঘৃণার বিষে অন্তর নীল হয়ে গেলে এমনিই হয়। দুঃখ হচ্ছে মেয়েটার জন্যে। তারপর কি হল?"

উঠে দাঁড়ালেন গভর্ণর—"রাত বারোটা বাজে। চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই। যেতে যেতে বলছি। ফিলিপের কি হল আগে শুনুন। চাকরীতে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েও আগের মত নাম কেনা আর সম্ভব হল না। রোডা তার মন ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল। রোডার স্মৃতি যেন ওর মনের আধখানা মরুভূমি করে দিয়েছিল। মানবিকতা জিনিসটা মুছে গিয়েছিল মন থেকে। তাই কিছুদিন বাদেই অবসর নেওয়া ছাড়া পথ রইল না। রিটায়ার করে ও ফিরে গেল তাদের কাছেই যারা ওকে ভালবেসেছিল, যেখান থেকে এ কাহিনীর শুরু—সেই নাইজিরিয়ায়।"

"মেয়েটার?"

"অবস্থা খুবই শোচনীয় হল। শুধু দাক্ষিণ্যের ওপর আর কদ্দিন চলে। আবার এয়ার হোসটেস হবার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু

অভব্যভাবে চাকরী ছাড়ার ফলে সে দরজাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রূপ ভাঙিয়ে কিছুদিন রক্ষিতা হিসেবেও ছিল অনেকের। কিন্তু বারমুডায় বারকয়েক হাতবদল হবার পর রূপাজীবাকে সাধারণ বেশ্যার পর্যায়ে নামতেই হবে। রোডার সেই অবস্থা আসন্ন হল। পুলিশের নেক-নজরও পড়ল তার ওপর। ঠিক তখন বিধাতা আবার সদয় হলেন। দেখলেন, ঢের হয়েছে। অনেক সাজা পেয়েছে মেয়েটা। তাই গভর্ণরের স্ত্রীর দয়ায় একটা চাকরী জুটলো জ্যামাইকায়। গাড়ী-ভাড়াও পাঠালেন তিনি। হোটেলে রিসেপশনিস্টের কাজ। বড় হোটেল। বহু ধনীর আবির্ভাব ঘটে সেখানে। একদিন এলেন কানাডার এক কোটিপতি। শীতকাল কাটিয়ে দেশে ফেরবার সময়ে রোডাকে কানাডায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেন। রোডা এখনও তাঁরই সহধর্মিণী।"

"দারুণ কপাল তো! বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া।"

"ঠিক তা নয়। জীবন বৈচিত্র্যে ভরা। ফিলিপের অনেক ক্ষতিই করেছে রোডা। তার সাজাও সে পেয়েছে। আসলে দায়ী হল ফিলিপের বাবা আর মা। ছেলেকে তাঁরা ভঙ্গুর করে গড়ে তুলেছিলেন। তাই ধাক্কায় গুঁড়িয়ে গিয়ে ফের মজবুত হয়েছিল ফিলিপ। রোডাকে বিধাতা পাঠিয়েছিলেন ওকে শক্ত করার জন্যেই। রোডা নিমিত্তমাত্র। যাক, রোডা এখন সুখী। তার স্বামীও সুখী। আজ রাতে তাদের মুখ আপনিও দেখেছেন।"

হেসে ফেলল বণ্ড। বলল—"ধন্যবাদ এই গল্পের জন্যে। আমাকে ক্ষমা করবেন। মিসেস হার্ভে মিলারকে আমি সইতে পারছিলাম না কিছুতেই। এ কাহিনী শোনবার পর তাঁকে জীবনে ভোলা যাবে না। আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছেন আমাকে। আজ থেকে কাউকেই আর অবজ্ঞা করব না।"

করমর্দন করে বিদায় নিল বণ্ড। ফটক পেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

অদূরে তার হোটেল। যেতে যেতে ভাবতে লাগল আগামীকালের কনফারেন্সের কথা। মিটিং আছে মিয়ামির উপকূল প্রহরী আর গোয়েন্দা-দপ্তরের সঙ্গে। একদিন এসব ভালই লাগত, রোমাঞ্চ বোধ হত, কিন্তু সেই মুহূর্তে সব কিছুই মনে হল নিরর্থক, একঘেয়ে।

৪

হিলডাব্র্যাণ্ড একটি দুষ্প্রাপ্য মাছ

গভীর জলের জগতে স্টিঙ-রে মানেই মূর্তিমান বিভীষিকা। ভোঁতা নাক থেকে মারাত্মক লেজ পর্যন্ত লম্বায় দশফুট। এক পাখনার ডগা থেকে আর এক পাখনার ডগা পর্যন্ত চওড়ায় ছ'ফুট। গাঢ় ধূসর রঙ, ঈষৎ বেগুনী আভা মিশানো। সোনালী বালির বুক থেকে উঠে কিছুদূর সাঁতরে যেতেই দূর থেকে মনে হল যেন একটা কালো তোয়ালে ঢেউয়ের তালে ভেসে ভেসে যাচ্ছে।

কৃত্রিম পাখনা লাগিয়ে সাঁতরাচ্ছিল জেমস বণ্ড। চোখ স্টিঙ-রে'র ওপর। খাবার দরকার না হলে মাছ মারে না বণ্ড। কিন্তু স্টিঙ-রে'কে সে মারবেই। কারণ স্টিঙ-রে সত্যিই শরীরী আতংক।

এপ্রিল মাস। সকাল দশটার মিঠে আমেজ আকাশে বাতাসে। সিসিলি দ্বীপপুঞ্জের মাহে দ্বীপের একটি অগভীর হ্রদে, হারপুন বন্দুক নিয়ে নেমেছে বণ্ড। চোখের আড়াল করছে না স্টিঙ-রে'কে। ও জানে, একটু পরেই ক্লান্ত হয়ে ফের বালিতে ঢুকে গিয়ে ঝিমোবে জলতলের ঐ মূর্তিমান বিপদ।

ছায়ামায়ায় আগুনের মত জ্বলছে ভারত মহাসাগরের দানবাকার অ্যানিমোন গুল্ম। ঝিকিমিকি করছে হীরেমাণিকের মত মাছের দল। প্রবাল স্তূপের সেকি বাহার। বণ্ডের চোখ কিন্তু এসব নিয়ে আর তন্ময় নয়। স্টিঙ-রে নীল দর্পণের মত শান্ত জলে ঢেউ তুলে ফিরেছে জিরোবে বলে। অতি সন্তর্পণে মাথা তুলল বণ্ড। গগলস-

এর জল বার করে দিয়ে ফের তাকালো সামনে। কিন্তু স্টিঙ-রেকে আর দেখা গেল না।

ডগায় ক্ষুদে ত্রিশূল গাঁথা শক্তিশালী হারপুন বাগিয়ে এবার শুরু হল স্টিঙ-রে'কে খুঁজে বার করার পালা। এগোতে হচ্ছে খুব সাবধানে। জল তোলপাড় হলেই আবার উধাও হবে স্টিঙ-রে। আবছা অন্ধকারে অন্য বিপদের প্রতীক্ষাও করছে বণ্ড। হাঙর জাতীয় চলন্ত ছায়াদানব এলেও আসতে পারে। অবশ্য জলে রক্ত মিশলেই এদের আগমনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তা নাহলে—

আচমকা মসৃণ বালির ওপর ছুটিমাত্র ফুটো দেখতে পেল বণ্ড। নাকের গর্তের মত ছুটি ছিদ্র। গর্ত ঘিরে থির থির করে কাঁপছে বালি। গর্তের ঠিক পেছনেই বালি খানিকটা উঠে রয়েছে—অর্থাৎ স্টিঙ-রের লুকোনো দেহ। ল্যাজের ধাক্কাটা কোনদিকে আসতে পারে হিসেব করে নিল বণ্ড। তারপরেই হারপুন-বন্দুক নামিয়ে টিপল ট্রিগার।

ওপর দিকে লাফিয়ে উঠল বালি। সেকেণ্ড কয়েক তো কিছুই দেখতে পেল না বণ্ড। পরক্ষণেই টান-টান হল হারপুনের দড়ি। ঐ তো স্টিঙ-রে। বিষাক্ত পাখনা নেড়ে পালাচ্ছে হারপুন গাঁথা শরীর নিয়ে। বিষযুক্ত যে পাখনায় মৃত্যু ঘটেছে ইউলিসিসের, যার ধাক্কায় আস্ত গাছ শুদ্ধ উপড়ে আসতে পারে, যার একটিমাত্র ঝাপটায় ভারত মহাসাগরের বিষ ছড়ানো জলে মৃত্যু অনিবার্য—তার ছোঁয়াচ থেকে বেশ খানিকটা তফাতে রইল বণ্ড। এককালে স্টিঙ-রে'র ল্যাজ দিয়ে দাস-ব্যবসায়ীরা চাবুক বানাতো। সিসিলিতে এ চাবুক রাখা বেআইনী হলেও ঘরে ঘরে তা আছে ব্যাভিচারীনী স্ত্রীদের শায়েস্তা করার জন্যে। মারাত্মক সেই ল্যাজের ঝাপটা যেন ক্রমশ কমে আসছে। অগভীর জলে এসে আচম্বিতে শূন্যে লাফিয়ে উঠল স্টিঙ-রে। আছড়ে পড়ল বালির ওপর। রোদ্দুরে সাদা পেট উল্টে খাবি খেতে লাগল অতিকষ্টে।

যমালয়ের পথ দেখতে পেয়েছে স্টিঙ-রে। কিন্তু ভারী মাছটাকে নিয়ে বণ্ড এখন করে কি?

খাকী সার্ট আর টাউজার্স পরা বেঁটেখাটো মোটাসোটা একটা লোক হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল তালগাছের ছায়া থেকে। বলল —"সাবাস, মিঃ জেমস বণ্ড!"

বণ্ড বলল—"ফাইডেল, এ ব্যাটা তো দেখছি সহজে মরবে না। হারপুনটাও গায়ে গেঁথে রয়েছে। কাউকে পাঠিয়ে দেবেন? কাঁহাতক দাঁড়িয়ে থাকা যায়।"

"ভাগ্যিস ঠিক জায়গায় হারপুন মেরেছেন, নইলে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে পাথরে আছড়াতো আপনাকে। যাক, লোক পাঠাচ্ছি আপনার হারপুন উদ্ধারের জন্যে। ল্যাজটা দরকার নাকি?"

হেসে ফেলল বণ্ড—"নিয়ে করবে কি? ঘরে বউতো নেই।"

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েছিল ফাইডেলের স্টেশন ওয়াগন। সিসিলি দ্বীপপুঞ্জে প্রায় সব কিছুই বার্বে ফ্যামিলির দখলে। ফাইডেল বার্বে এঁদের কনিষ্ঠতম কুবের। গাড়ীর দিকে যেতে যেতে বলল সে, —"মিলটন ক্রেস্টের নাম শুনেছেন? মার্কিন কুবের। ক্রেস্ট হোটেল গ্রুপের মালিক। ক্রেস্ট ফাউণ্ডেশনের কর্ণধার। এমন একখানা বজরার মালিক যার জুড়ি সারা ভারত মহাসাগরে নেই। নাম, 'ওয়েভক্রেস্ট'। দেখবার মত বজরা। সুন্দরী বউ থেকে পেল্লায় ট্রানসিস্টর গ্রামোফোন পর্যন্ত, সবই আছে সে বজরায়। আগাগোড়া এয়ারকণ্ডিশন করা। দামী কার্পেট পাতা। ব্রেকফাস্টে প্যারিসের সেরা শ্যাম্পেন। আরে মশাই কি যে নেই সেখানে, তাই ভাবি। মিস্টার ক্রেস্ট বজ্জাত হলেন তো বয়ে গেল, বজরাটা তো আরাম দেয়।"

"আরাম দিক, আর না দিক, তাতে আমার কি?"

"মাই ফ্রেণ্ড, মিস্টার ক্রেস্টের সঙ্গে দিন কয়েক হাওয়া খেতে

বেরোচ্ছি। আপনিও আসছেন। ডাকসাইটে সুন্দরী মিসেস ক্রেস্টও থাকছেন। যাচ্ছি শাগ্রিন দ্বীপে। বছর পাঁচেক ও তল্লাটে যেতে পারিনি। ক্রেস্টের খুব সখ হয়েছে যাবার। ভদ্রলোকের নাকি সামুদ্রিক নমুনা সংগ্রহের বাতিক। ফাউণ্ডেশনের ব্যাপার। শাগ্রিন দ্বীপে এমন কতকগুলো মাছ পাওয়া যায় যা নাকি তুনিয়ার আর কোথাও পাওয়া যায় না। রগড় কম নয় দেখে নিয়ে যাচ্ছি ওদের পথ দেখিয়ে।"

"রগড় জমবে ভালই। কিন্তু আমাকে টানাহ্যাঁচড়া কেন?"

"একঘেয়ে দিনগুলো আর কাটাতে পারছিলেন না বলে। ক্রেস্টকে শুনিয়ে দিলাম, আপনার মত তুঁদে ডুবো-সাঁতারু বড় একটা চোখে পড়ে না। শুনেই লাফিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। জানতাম ঘুরঘুর করছেন এই অঞ্চলেই। শেষকালে একজন জেলের কাছে শুনলাম, কে একজন ডাকাবুকো সাদা-চামড়া নাকি আত্মহত্যার মতলব এঁটে সমুদ্রে ডুব দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, আপনিই সেই আত্মঘাতী পুরুষ।"

অট্টহেসে বণ্ড বলল—"বুঝি না এরা কেন সমুদ্রকে এত ভয় পায়। সাঁতার জানে এমন সিসিলি সুন্দরীও মেলা ভার।"

"রোমান ক্যাথলিক তো। খালি গা হতে চায় না। আপনাকেও বলি, উপোষা হাঙরের পাল্লায় পড়লে মজাটা টের পেতেন। পাথুরে মাছ মাড়ালে তো কথাই নেই। সঙ্গে সঙ্গে ধনুকের মত দেহ তেউড়ে যেত সাংঘাতিক যন্ত্রণায়।"

বণ্ড বললে—"জুতো পরলে বা পায়ে ন্যাকড়া জড়ালেই পাথুরে মাছকে টেক্কা মারা যায়।"

মাসখানেক আগে বণ্ডকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন 'এম'। হুকুম দিয়েছিলেন সিসিলি যেতে। বলেছিলেন—"মালদ্বীপের জাহাজ

ঘাঁটিতে বড্ড অশান্তি দেখা দিয়েছে। সিংহল থেকে কম্যুনিস্ট আসছে। ফলে স্ট্রাইক আর স্যাবোটাজ লেগেই আছে। যন্ত্রপাতি তছনছ হচ্ছে গোপনে। হয়তো ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে সিসিলিতে। জায়গাটা হাজার মাইল দক্ষিণে হলেও নিরাপদ। তা সত্বেও একটা রিপোর্ট দেওয়া দরকার। তাই তোমায় পাঠাচ্ছি। বছর কয়েক আগেও কিছু গোলমাল তো ছিল ওখানে। জাপানী জেলে নৌকো, ইংল্যাণ্ডের দাগাবাজ, ফ্রান্সের সঙ্গে আঁতাত। যাক, গিয়ে ছ্যাখো, নিরপেক্ষ রিপোর্ট পাঠাও। আর হ্যাঁ, বেশী রোদ লাগিও না। সর্দিগর্মি হবে।"

দিন সাতেক আগেই রিপোর্ট লেখা শেষ করেছে বণ্ড। লিখেছে, জায়গাটা সত্যিই নিরাপদ। তুলকালাম কাণ্ড ঘটতে পারে শুধু একটি কারণে। সে কারণটি হল, সিসিলি সুন্দরীদের ভুবনমোহিনী রূপ। পাওয়াও যায় অঢেল—চাইলেই হল।

রিপোর্ট শেষ। হাত খালি। এখন কবে 'কাম্পালা' জাহাজে মোম্বাসা যাওয়া হবে, তারই প্রতীক্ষা। গরমে প্রাণ আইঢাই করলেও রেহাই নেই।

বার্বে-ভবনেই ডেরা নিয়েছিল বণ্ড। সাতটা দিন কেটেছে তাল-কুঞ্জে আর সমুদ্র স্নান নিয়ে। সাঁতারের পোশাক ছেড়ে মালপত্র নিয়ে ওখান থেকেই দুজনে রওনা হল ক্রেস্টের বজরা অভিমুখে। দূর থেকে ওয়েভক্রেস্ট-কে দেখে আহামরি কিছু মনে হয় না। বণ্ডের পাকাচোখ কিন্তু এক পলকেই বুঝেছিল, সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পাড়ি দেবার উপযুক্ত এ জাহাজ। দারুণ মজবুত। পলকা বজরা নয় মোটেই।

ডেকে উঠে বসবার ঘরে ঢুকল বণ্ড। হিমেল হাওয়ায় গা যেন জুড়িয়ে গেল। দামী দামী আসবাবপত্রে ঠাসা ঘর। এ ঘর যেন জাহাজে মানায় না—মানায় রাজপ্রাসাদে। নীলচে কার্পেট,

রূপোলী দেওয়াল, সাদাটে কড়িকাঠ। মস্ত গ্রামোফোনের পাশেই সাইডবোর্ডে থরে থরে সাজানো মদিরা সম্ভার। মাঝের টেবিলে হায়াসিনথ-এর গুচ্ছ! ম্যাগাজিনের স্তূপ!

"কিহে জেমস, কি বলেছিলাম?"

বণ্ডের চোখে অকৃত্রিম তারিফ—"সত্যিই এমন না হলে সাগর অভিযান মানায়! হাওয়া কত তাজা দেখেছেন!"

"এ হাওয়া টিনভর্তি বাসি হাওয়া। তাজা হাওয়া পাবেন বাইরে।" কথাটা বললেন মিস্টার মিলটন ক্রেস্ট স্বয়ং। কখন জানি ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন ভদ্রলোক। বছর পঞ্চাশ বয়স। মজবুত গড়ন। ফিকে বাদামী চোখ। রোদে জলে তামাটে মুখ। ঢুলুঢুলু চোখে অপরিসীম তাচ্ছিল্য। কথা বলার ধরণটা কেমনতর। গা-পিত্তি জ্বলে যায়। গলার স্বরটি অবশ্য খাসা। সিল্ক-মসৃণ। হামফ্রি বোগার্টের কণ্ঠস্বর মনে করিয়ে দেয়। কাঁচা-পাকা চুল। ডানবাহুতে আঁকা উল্কি—নোঙরের ওপর উড়ছে ঈগল পাখী। মনে মনেই বলল বণ্ড, হেমিংওয়ে হবার ইচ্ছেও আছে দেখছি। কিন্তু আমার সঙ্গে তো জমবে না মোটেই।

কার্পেট মাড়িয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন ক্রেস্ট—"আপনার নাম বণ্ড? কি সৌভাগ্য আজ। ডুব-সাঁতারে অ্যাকোয়ালাঙ নেন, না এমনিই ডুব মারেন?"

"এমনিই। বেশী গভীরে যাইনা। নিছক সখ।"

"বাকী সময়টা কি করেন?"

"সরকারী চাকরী।"

সশব্দে অনুকম্পার হাসি হাসলেন মিস্টার ক্রেস্ট। হাসি তো নয়, যেন কুত্তার ডাক। বললেন—"দাসত্ব আপনাদের রক্তে। বলিহারি যাই আপনাদের, মানে, ইংরেজদের। তামাম দুনিয়ায় আপনাদের টেক্কা মারতে পারে এমন খানসামা আর বাটলার তো দেখিনা।"

বণ্ডের মেজাজ সপ্তমে চড়তে চড়তে আটকে গেল প্রায় বিবসনা এক সুন্দরীর আবির্ভাবে। রোদে জ্বলা সারা গা। পরনে এক চিলতে বিকিনি ছাড়া কিছুই নেই।

"এই তো মানিক আমার! ছিলে কোথায় এতক্ষণ? শ্রীমুখ কতক্ষণ দেখিনি বলোতো? এসো আলাপ করিয়ে দিই। ইনি মিস্টার বার্বে, আর ইনি মিস্টার বণ্ড।" বলে, রূপসীর দিকে হাত বাড়িয়ে—"ইনি হলেন আমার স্ত্রী, মিসেস ক্রেস্ট। পঞ্চম মিসেস ক্রেস্ট। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা তো, সন্দেহ হতে পারে আদৌ বউ ভালবাসে কিনা। তাই বলে রাখি, ভদ্রমহিলা স্বামীঅন্ত প্রাণ। তাই না মাণিক?"

"কি যে করো মিল্ট," ভুবনমোহিনী হাসি হেসে বলল মিসেস ক্রেস্ট। "মিস্টার বণ্ড, মিস্টার বার্বে, এক ঢোক সুরাপান হয়ে যাবে নাকি?"

"এখন নয়, এখন নয়," সরব হলেন মিস্টার ক্রেস্ট, "আগে যার যা কাজ বুঝিয়ে দিই।"

"যথা?"

"আমি হলাম গিয়ে 'ওয়েভক্রেস্টে'র ক্যাপ্টেন। মিস্টার বার্বে, কি বলে ডাকা যায় বলুন তো আপনাকে? ফাইডেল? উঁহু, বড্ড বড় নাম। আমি ফিডো বলেই ডাকব। আপনি আমার সঙ্গে ডিউটি দেবেন ব্রীজে। মিস্টার বণ্ড, ডাকনাম কি আপনার? জেমস? আমি বলব, জিম। মিসেস ক্রেস্টকে স্বচ্ছন্দে লিজ বলে ডাকতে পারেন। মাভৈঃ। দুজনে মিলে চটপট লাঞ্চ খাবার আগেই মদ্যপানের সরঞ্জাম সাজিয়ে ফেলুন তো। এবার যাওয়া যাক।"

খরগোসের মত ক্ষিপ্রচরনে চোখের আড়াল হলেন মিস্টার ক্রেস্ট। মিসেস ক্রেস্ট কাঁচুমাচু মুখে বলল—"কিছু মনে করবেন না ওর কথায়। ওর ঠাট্টার ধরনটাই অমনি।"

বণ্ড শুধু হাসল। না জানি ভদ্রমহিলাকে কতবার এই একই কথা বলতে হয়েছে স্বামীরত্নের ঠাট্টায় অতিথিদের তেরিয়া মেজাজকে ঠাণ্ডা করতে। মুখে বলল—"ওঁর জানার এখনো অনেক বাকী। আমেরিকাতেও এমনি কথা বলেন ?"

"আমেরিকানদের উনি ভালবাসেন। ঝাল ঝাড়েন কেবল আমার ওপর। তাও জাহাজে উঠলেই। ওঁর বাবা তো খাঁটি জার্মান। তাই ধারণা, ইউরোপীয়ান মাত্রেই ধ্বংসের পথে পা বাড়িয়েছে। তর্ক করে লাভ নেই বলেই চুপ করে থাকি।"

বটে! আবার সেই বস্তাপচা জার্মান দম্ভ! ইংরেজ বউকে নিশ্চয় তাহলে ক্রীতদাসী জ্ঞান করেন! বণ্ড শুধোলো—"আপনাদের বিয়ে হয়েছে কদ্দিন ?"

"দু'বছর। ওঁরই একটা হোটেলে রিসেপসনিস্ট ছিলাম আমি। উনি আমাকে একদিন দেখলেন। তারপর যেন রূপকথা শুরু হল। এত ভালবাসেন যে কি বলব। যেখানে যাই সেখানেই খাতির পাই রাজরাণীর মত। সারা আমেরিকায় ওঁর নামডাক কি কম!"

"খাতির জিনিসটা ওঁর খুবই পছন্দ, তাই না ?"

"তা ঠিক," এবার আর হাসতে পারল না সুন্দরী। "ভেতরে উনি কিন্তু ক্ষুদে নবাব। পান থেকে চুন খসলেই তাই তুলকালাম কাণ্ড বাধান। ঐরে, ইঞ্জিন চালু হয়ে গেছে। আপনি ডেকে গিয়ে দাঁড়ান, আমি আসছি।"

বেরিয়ে এল বণ্ড। দেখল, মাহের সবুজ তীরভূমি ক্রমশ দূরে সরে যচ্ছে। মিস্টার ক্রেস্ট কি পাঁড় মাতাল ? মিসেস ক্রেস্ট কি যমের মত ভয় করে স্বামীকে ? দুবছর হল বিয়ে হয়েছে। 'রূপকথার' দাম নিশ্চয় কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হচ্ছে ভদ্রমহিলাকে। কতই বা বয়স মেয়েটির। তিরিশের বেশী নয় মোটেই। ছাইয়ের মত উজ্জ্বল চুল। বড় ভাসাভাসা চোখ। ঠোঁটে লিপষ্টিক নেই. নখে রঙ

নেই। স্বামীর হুকুম হয়তো তাই, সাজগোজ চলবে না। স্বামীকে তো দেখা গেল জুজুর মত ভয় পায় স্ত্রী। আচ্ছা, ভদ্রলোক পুরুষত্ব-হীন নন তো? বাইরের হাঁকডাক আর তম্বিতম্বা দিয়ে ভেতরের দুর্বলতাকে ঢাকবার চেষ্টাও হতে পারে। এ লোকের সঙ্গে চার-পাঁচদিন এক জাহাজে থাকা তো চাট্টিখানি কথা নয়। ভাবনায় পড়ল বণ্ড।

"হ্যালো জিম, আমার বউ কোথায়?" বোট-ডেক থেকে হাঁক শোনা গেল মিস্টার ক্রেস্ট-এর।

"আসছেন," বলল বণ্ড।

একলাফে বোট-ডেক থেকে নীচের ডেকে নেমে এলেম মিস্টার ক্রেস্ট—"জাহাজ দেখবেন তো চলুন ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি।"

শুরু হল জাহাজ পরিক্রমা। সব কিছুই মিস্টার ক্রেস্টের মুখস্থ। গড় গড় করে একাই বলতে লাগলেন টেকনিক্যাল খুঁটিনাটি। ঘুরতে ঘুরতে এলেন নিজের শোবার ঘরে। দরজায় টোকা না দিয়েই ঢুকলেন ভেতরে। দেখা গেল, ড্রেসিং টেবিলে বসে সাজ গোজ করছে মিসেস ক্রেস্ট।

"তোমাকে বললাম না মদের গেলাস টেলাস রেডী করতে? তা না করে সাজতে বসেছো? জিম-এর জন্যে এক পোঁচ বেশী রুজ লাগানো হচ্ছে বোধহয়?" হামফ্রি বোগার্ট কণ্ঠে বললেন মিস্টার ক্রেস্ট।

মুখ আমসি করে উঠে দাঁড়াল মিসেস ক্রেস্ট—"এই আসছি"—বলেই উধাও হল পাশের দরজা দিয়ে।

যেন কিছুই হয় নি, এমনি ভাবে এ ঘরের বর্ণনায় মুখর হলেন মিস্টার ক্রেস্ট। বণ্ডের চোখ কিন্তু ডবল বেডের পাশের টেবিলে রাখা চাবুকটার দিকে। ফুট-তিনেক লম্বা চামড়ার হাতলঅলা চাবুক। শংকর মাছের ল্যাজ দিয়ে বানানো।

বিছানা ঘুরে গিয়ে চাবুকটা তুলে নিল বণ্ড। বলল—"পেলেন কোথায় ? আজ সকালেই তো একটা শংকরমাছ খতম করলাম।"

শুকনো হেসে বললেন মিস্টার ক্রেস্ট—"আরবরা শুনেছি বউ শায়েস্তা করে এই দিয়ে। আমাকেও এক ঘায়ের বেশী কোনোদিন দিতে হয় নি। এক ঘায়েই সিধে হয়ে যায় লিজ। চাবুক বটে। সাংঘাতিক কাজ দেয়।"

শক্ত চোখে তাকায় বণ্ড—"সিসিলিতে এ জিনিস ঘরে রাখাও বেআইনী জানেন তো ?"

"এ জাহাজে যুক্তরাষ্ট্রের এখতিয়ার—সিসিলির নয়," বলে দরজার দিকে এগোলেন মিস্টার ক্রেস্ট। "চলুন, গলা কাঠ হয়ে গেছে, একটু মদ খাওয়া যাক।"

লাঞ্চের আগে ভডকা আর লাঞ্চের সঙ্গে বিয়ার খেলেন মিস্টার ক্রেস্ট। অত খেয়েও গলা কাঁপল না। কথার ফোয়ারাও কমল না। ফিকে চোখ দুটো সামান্য ছলছলে হল বটে, কিন্তু টেবিল মাতিয়ে রাখলেন একাই। ফাউণ্ডেশন বস্তুটা কি, তা বুঝিয়ে দিলেন। আমেরিকায় যার টাকা বেশী, সে যদি ট্যাক্স ফাঁকি দিতে চায়, তাহলে সৎ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ফাউণ্ডেশনের নামে এক কাঁড়ি টাকা গচ্ছিত রাখলেই হল। টাকাটা নিজের নামে বা আত্মীয়-স্বজনের নামে সরালে কিন্তু চলবে না। ক্রেস্ট ফাউণ্ডেশনে উনি এক কোটি ডলার রেখেছেন। সেই টাকাই ভেঙে বৈজ্ঞানিক অভিযানের নামে বছরে তিন মাস সাত সমুদ্দুর ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সখও মিটছে, টাকারও সদ্গতি হচ্ছে। দুষ্প্রাপ্য নমুনা সংগ্রহ করছেন ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠিত ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের জন্যে। টাকা ছড়ালেই নমুনা মেলে। যেমন, সিসিলিতে দুটি জিনিস সংগ্রহ করা বেআইনী। প্রাসলিন দ্বীপের কালো কাকাতুয়া আর আলডাবরার দানব কচ্ছপ। মিস্টার ক্রেস্ট গিয়ে সোজা গভর্ণরকে একটা চেক লিখে দিলেন,—দশহাজার

ডলার দান করছেন। সুইমিং পুল বানিয়ে বাচ্ছাদের সাঁতার শেখাতে হবে। প্রতিদানে পেলেন কাকাতুয়া আর কচ্ছপ। শামুকের অনেকগুলো নমুনা সংগ্রহ করলেন একজনকে পাঁচ হাজার ডলারের চেক দিয়ে। সে তো চেক হাতে নিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে বসে গেল। এইভাবে খোলামকুচির মত টাকা ছড়িয়ে এর মধ্যেই লম্বা ফর্দের তিন ভাগ নমুনা যোগাড় করে ফেলেছেন।

বণ্ড বলল—"দেশে ফিরলে আপনাকে মেডেল দেওয়া উচিত। মাছ সম্বন্ধে কি যেন বলছিলেন?"

ড্রয়ার খুলে টাইপ করা একটা কাগজ বার করলেন মিস্টার ক্রেস্ট।

"শুনুন। দুষ্প্রাপ্য মাছ হিলডাব্র্যাণ্ডকে সর্বপ্রথম জাল ফেলে ধরেন প্রফেসর হিলডাব্র্যাণ্ড সিসিলি দ্বীপপুঞ্জের শাগ্রিন দ্বীপের কাছে ১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে। তারপর সংক্ষেপে শুনুন। এ মাছ কাঠবেড়াল জাতীয় মাছেদের মধ্যে নাকি অনন্য। একটা মাছই আজ পর্যন্ত ধরা পড়েছে। লম্বায় ইঞ্চি ছয়েক। ঝকঝকে গোলাপী রঙ—তাতে আড়াআড়িভাবে কালো ডোরা। পাখনাগুলো গোলাপী। ল্যাজ কালো। চোখ বেশ বড়, রঙ গাঢ় নীল। সাবধানে ধরা দরকার, পাখনাগুলো নাকি সাংঘাতিক রকমের ছুঁচোলো। এই হল হিলডাব্র্যাণ্ড মাছের কেচ্ছা। পুঁচকে একটা মাছের জন্যে কয়েক হাজার ডলারের শ্রাদ্ধ। তা সত্ত্বেও কিনা রাজস্ব বিভাগে বছর দুয়েক আগে কানা ঘুষো শুনেছিলাম, আমার ফাউণ্ডেশনটাই নাকি চারশো বিশ কারবার!"

ফস করে লিজ বলল—"কথাটা মিথ্যে নয়, মিল্ট। দামী দামী নমুনা না দেখাতে পারলে ট্যাক্সের ছিনেজোঁকরা কিন্তু তোমার এই বজরা আর যত বাজে খবর সবই বন্ধ করবার চেষ্টা করে আসছে গত পাঁচ বছর ধরে।"

"মাণিক," মখমলের মত মসৃণ কণ্ঠ মিস্টার ক্রেস্টের—"আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে প্যান প্যান না করলেই ভাল করতে। ফল কি হল জানো? চাবুকটার এক ঘা পাওনা হয়ে গেল। আজ রাতেই পাওনা মিটিয়ে দেব, কেমন?"

নিঃসীম আতংকে গুড়িয়ে উঠল সুন্দরী লিজ।

তৃতীয় দিন ভোরবেলা শাগ্রিন দ্বীপ দেখা গেল দূর থেকে। সবুজের সঙ্গে সাদা মিশোনো একটা বিন্দু দূরদিগন্ত থেকে যেন ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বণ্ড। কয়েক ঘণ্টার জন্যেও তো মিলটন ক্রেস্টের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকা যাবে।

নোঙর ফেলা হল দশ ফ্যাদম দূরে। স্পীডবোট চেপে পৌঁছোনো হল দ্বীপে। যেন একটা ক্ষুদে প্রবাল দ্বীপ। ঘাট বিঘে বালি আর প্রবাল। নেকলেসের মত পাথরের বলয়ের মধ্যে শান্ত জল, অগভীর, চওড়ায় প্রায় পঞ্চাশ গজ। সাগরের ঢেউ ফুঁসছে কণ্ঠহারের পাথরে—ভেতরে নেই কোনো চাঞ্চল্য। মেঘের মত আকাশ কালো করে পাখীর দল ডাঙা ছেড়ে শূন্যে উঠল ওরা দ্বীপে নামতে। পাখীর বিষ্ঠার অ্যামোনিয়া গন্ধ। সাদাটে চড়ায় কাঁকড়ার সঞ্চরণ।

সাদা বালির ওপর তাঁবু খাটানোর হুকুম দিলেন মিস্টার ক্রেস্ট। সাঁতারের মুখোস পরে বণ্ড আর ফাইডেল বার্বে ঝাঁপ দিল জলে। মিসেস ক্রেস্টও ডুব দিয়ে দিয়ে শামুক তোলার খেলায় মাতলেন। কে বলবে, গতদিন এই মেয়েই কেবিন থেকে বেরোয় নি। মিস্টার ক্রেস্ট শরীর খারাপের অছিলা দিয়েছিলেন। মাথাধরা।

জলের তলায় প্রতিটি জলচর জীবের চালচলন দেখতে দেখতে সাঁতরে চলল বণ্ড। একইভাবে ওদিক দিয়ে এগোলো ফাইডেল বার্বে। বণ্ডের চোখ খুঁজছে হিলডাব্র্যাণ্ড মাছকে, মন কিন্তু ভাবছে লিজকে। স্বামীহত্যা না করে বসে মেয়েটা! চাবুকে ফের হাত

দিলেই রিভলবার বা ছোরা নিয়ে হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে পিশাচ পতিদেবতার ওপর। বিচারে রেহাই পাবে লিজ। চাবুকটা কোর্টে হাজির করলেই বেকসুর খালাস পাবে। বগু কি ওর কানে সেই মন্ত্র দেবে? বলবে কি—'লিজ, স্বামীহত্যা করতে চাও করে ফ্যালো'? ধুত্তোর! পরের সমস্যা নিয়ে একি উদ্ভট চিন্তা? এমনও তো হতে পারে, মেয়েটা ধর্ষণকামী? পিটুনী না খেলে আনন্দ পায় না?

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে এক পাক ঘুরে এল বণ্ড। ফাইডেল বার্বেও পৌঁছে গেছে। বণ্ডকে দেখেই বললে—"বড় বড় শুক্তি দেখলাম। আকারে যেন ফুটবল। কাকাতুয়া মাছও বিস্তর। ভাবছি ফিরে গিয়ে লোক পাঠাবো। জাহাজ ভর্তি করে নিয়ে যাক। মোটা দাঁও পেটা যাবে।"

তাঁবুতে ফিরে আসতেই মিস্টার ক্রেস্ট প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন ওদের শূন্যহস্ত দেখে। নিজেই নামলেন জলে। সঙ্গে ওদেরই একটা মুখোস।

কিছুক্ষণ পরেই হাঁকডাক ভেসে এল। বণ্ড আর ফাইডেল বার্বে দৌড়ে গিয়ে দেখল হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন মিস্টার ক্রেস্ট। খেউড় মিশিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি যা বললেন তার অর্থ এই,—দু'দুটো ওস্তাদ ডুব-সাঁতারু জল তোলপাড় করে এসেও যা পারে নি, মিস্টার ক্রেস্ট জলে নেমেই তা পেরেছেন। হিলডাব্র্যাণ্ডকে দেখা গিয়েছে। ঐ যে নীল কুয়াশার মত জলতলের আবছা অঞ্চল, ঐখানেই ব্যাটা লুকিয়ে আছে।

বণ্ড বলল—"বেশ তো, ধরবেন কি করে?"

চোখ টিপে মিস্টার ক্রেস্ট বললেন—"জলে বিষ ঢেলে। ব্রেজিলে এই দিয়ে মাছ ধরে। গাছের শেকড়ের নির্যাস। নাম, রোটেনন। এতে মাছের কানকোর মধ্যে রক্তবহা ধমনী-শিরাগুলো কুঁচকে যায়।

দম বন্ধ হয়ে মারা যায় মাছ। মানুষের কিছু হয় না কানকো নেই বলে। জিম, তুমি গিয়ে দেখ। হিলডাব্র্যাণ্ডকে ল্যাজ নাড়তে দেখলেই আঙুলের ইসারা করবে। তবে আমি জলে রোটেনন ঢালবো। নইলে নয়। পাঁচ গ্যালনের একটা মাত্র টিন ছাড়া আর বিষ নেই, কাজেই নষ্ট না হয়।"

জলে মুখ ডুবিয়ে ওৎ পেতে রইল বণ্ড। মিনিট খানেকও গেল না, দেখা গেল হিলডাব্র্যাণ্ডকে। ওর মুখের কাছে এসে চোখ তুলল। মুখোস দেখে মনে ধরল না বোধহয়। সুট করে উধাও হল নীলচে কুয়াশার মধ্যে।

জলতলের বিচিত্র সাম্রাজ্য দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে মনটা যেন কিরকম হয়ে গেল বণ্ডের। পাঁচহাজার মাইল দূরে একটা মিউজিয়ামের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে একটি মাত্র মাছ হত্যা করার দরকার। কিন্তু জলে বিষ ঢাললেই সেই বিশেষ একটির সঙ্গে শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে জলচর জীবরা মারা পড়বে। নিজেকে অপরাধী মনে হল বণ্ডের। মনে হল নাগাসাকির ওপর অ্যাটম বোমা ফেলার তোড়জোড় চলছে—ট্রিগার টেপার ভার বণ্ডের ওপর।

হিলডাব্র্যাণ্ড আবার আসছে। জলজ উদ্ভিজ্জের নীলচে কুয়াশার মধ্যে থেকে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে বেরিয়ে এল উজ্জ্বল গোলাপী মাছটা। কাছে আসতেই জলের মধ্যে মুখ রেখেই মুখোসের মধ্যে খেঁকিয়ে উঠল বণ্ড—"বেরো, বেরো, দূর হ।" বলেই, হারপুন দিয়ে মারল এক খোঁচা। পাঁই পাঁই করে ফের নীলচে কুয়াশার মধ্যে উধাও হল হিলডাব্র্যাণ্ড।

'স্যাবোটাজ' করল বণ্ড। মিস্টার ক্রেস্টের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার জন্যে মাছটাকে দিল খেদিয়ে, তারপর ইসারা করতেই টিনভর্তি বিষ জলে ঢেলে দিলেন মিস্টার ক্রেস্ট।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্রোতের টানে ভেসে এল রাশি রাশি মৃতদেহ।

মরা অক্টোপাস, বান মাছ, তলপেট-সাদা মাছ—আরও কত জলচর জীব। থ হয়ে দেখতে লাগল বণ্ড। মৃতদেহের সংখ্যা কমে আসছে। জলের বিষ বোধহয় স্রোতের টানে সরে গেল অন্যত্র। বেঁচে গেল হিলডাব্র্যাণ্ড।

সহসা নীল কুয়াশার মধ্যে থেকে ফের বেরিয়ে এল উজ্জ্বল গোলাপী সেই মাছটা। সিধে আসছে বণ্ডকে লক্ষ্য করে। জলে হাত ডুবিয়ে জোরে হাত নাড়ল বণ্ড। তবুও আসছে হিলডাব্র্যাণ্ড। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে ওর আসার পথেই হাঁটতে শুরু করল বণ্ড। আশপাশে ভাসছে মরা মাছ। তার মধ্যে লাল-কালো ভারী সুন্দর হিলডাব্র্যাণ্ড থমকে দাঁড়াল, কেঁপে উঠল থরথরিয়ে। পরমুহূর্তেই ছিটকে এল বণ্ডের দুপায়ের ফাঁকে। আর নড়ল না।

মিস্টার ক্রেস্টের হাতে মাছটা তুলে দিল বণ্ড। তারপর ঝাঁপ দিল জলে।

ফেরার পথে রাত্রে ভোজসভার আয়োজন করলেন মিস্টার ক্রেস্ট। খেতে বসে আকণ্ঠ মদ গিলে যাচ্ছেতাই বলতে লাগলেন বণ্ড আর ফাইডেল বার্বেকে। সব মদ মিশিয়ে প্রায় বোতল খানেক গেলার পর কথা জড়িয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সিল্কের মত মসৃণ কণ্ঠ মসৃণ হল আরো, সিগার জ্বালাতে সময় লাগল আরো বেশী, একটা গেলাস টেবিল থেকে ঠিকরে গেল মেঝেতে। তারপরেই শুরু হল আক্রমণ। প্রথমে ঝেড়ে কাপড় পরালেন বণ্ডকে। বর্তমান বিশ্বে শক্তিশালী রাষ্ট্র বলতে শুধু তিনটি—আমেরিকা, রাশিয়া আর চীন। ইংল্যাণ্ডে প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ আর একটা রাণী ছাড়া কিছু নেই। ফ্রান্সে মেয়ে সস্তা। ইটালিতে শুধু রোদ পোহানো। জার্মাণী এখনো যৎসামান্য আছে বটে, কিন্তু দু'দুটো যুদ্ধে হেরে ওরা ভূত হয়ে গিয়েছে।

কান ঝালাপালা হয়ে গেল বণ্ডের। তাই মুখটিপে শুধু বলল—“আমেরিকা সম্বন্ধেও একটা কথা শুনি।”

“কী ?”

“আমেরিকা ছিল শিশু, হয়েছে সরাসরি স্থবির। বুদ্ধি পাকানোর সুযোগ ঘটেনি।”

“বাঃ, কথাটা মন্দ নয় তো”, বলে স্ত্রীর দিকে তাকালেন মিস্টার ক্রেস্ট, “মাণিক, এই কথাটাই তুমি সেদিন বলছিলে না ?”

শংকা ঘনিয়ে এল লিজের চোখে। বলল আস্তে—“আমি তো ঠাট্টা করেছিলাম। খবরের কাগজে কমিক ছবি দেখে বলেছিলাম যত্তো ছেলেমানুষী।”

“ঠাট্টাটা ভালোই। মনে থাকবে,” বলতে বলতে আরো নরম হয়ে এল মিস্টার ক্রেস্টের সিল্ক-মসৃণ কণ্ঠ। “মনে থাকবে। নিশ্চয় মনে থাকবে, মাণিক।”

বণ্ডের ইচ্ছে হল চোয়ালে একটি ঘুসি মেরে থামিয়ে দেয় মাতাল-টাকে। কিন্তু তার আগেই বণ্ডকে ছেড়ে ফাইডেল বার্বেকে নিয়ে পড়লেন ভদ্রলোক,—“ফিডো, বলিহারি যাই তোমাদের এই দ্বীপ-মালাকে। ম্যাপে প্রথমবার দেখে ভেবেছিলাম মাছির বিষ্ঠা। হাত দিয়ে মুছতেও গিয়েছিলাম। মানুষ এখানে থাকে কি করে ? এলাম শুধু তোমাদের ফ্যামিলি কেচ্ছা শুনে। তোমাদের কে একজন নাকি শ'খানেক জারজ সন্তানের জন্ম দিয়েছে ?”

“আমার কাকা, গ্যাসটন। ফ্যামিলির নাম ডুবিয়েছেন উনি। জিনিসটা কারোরই ভালো লাগেনি। আমাদের অবস্থাও খারাপ হয়েছে ওঁর জন্যে।”

“অবস্থা ? কড়ির কারবার নাকি ?”

“না। একশ বছর আগে কচ্ছপ আর মুক্তো চালান দেওয়া হত। এখন নারকেল।”

"পরিবারের জারজদের কুলি বানিয়ে নিশ্চয় ? মন্দ নয়। এরকম কুলির দল তো আমিও বানাতে পারি," বলে তাকালেন বউয়ের পানে। নতুন নষ্টামি শুরু হওয়ার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বণ্ড।

ডেকে গিয়ে দাঁড়াল খোলা হাওয়ায়। দশ মিনিট পর পায়ের শব্দ শোনা গেল বোট-ডেকের সিঁড়িতে। ঘুরে দাঁড়াল বণ্ড। লিজ ক্রেস্ট দাঁড়িয়ে পেছনে।

ক্লান্ত কণ্ঠ লিজের—"শুতে যাচ্ছিলাম। তারপর ভাবলাম খোলা হাওয়ায় একটু ঘুরে যাই।"

"বেশ করেছেন। আমি তো ডেকে দাঁড়াই তারা দেখবার জন্যে। এত তারা একসঙ্গে জীবনে দেখিনি।"

"জানেন, ছেলেবেলায় আমি কিন্তু ভাবতাম তারাগুলো আসলে আকাশের ছেঁদা।"

"বেশ করতেন। বৈজ্ঞানিকদের সব কথা বিশ্বাস না করাই ভাল। দেশ কোথায় আপনার ?"

"নিউ ফরেস্ট। রিংউড। ইচ্ছে আছে আবার সেখানে যাবার।"

"যান না। এখানে তো আপনার মন বিষিয়ে উঠেছে দেখছি।"

বণ্ডের বাহুতে হাত রাখল লিজ—"ও কথা বলবেন না। লোকজন আমার ভাল লাগে। কথা বলতে ভাল লাগে। আপনার সঙ্গে এই যে ক'মিনিট কাটিয়ে গেলাম, একি ভোলবার !" বলেই, সহসা শক্ত মুঠোয় বণ্ডের হাত চেপে ধরল—"কিছু মনে করবেন না। হঠাৎ ইচ্ছে হল হাত ধরবার। এবার যাই, শুইগে।"

সিল্ক মসৃণ স্বরটা ভেসে এল ঠিক পেছন থেকে—"বটে ! বটে ! শেষে ডুব-সাঁতারুর সঙ্গে হলায় গলায় !"

দেখা গেল, সেলুনের দরজার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে মিস্টার ক্রেস্ট। দু-হাত মাথার ওপরকার কাঠে। আলো পেছনে থাকায় মনে হচ্ছে যেন একটা মস্ত বেবুন দাঁড়িয়ে।

এক পা এগিয়ে গেল বণ্ড। নিশপিশ করে উঠল দুহাত। চট করে চোখ দিয়ে মেপে নিল মিস্টার ক্রেস্টের তলপেট ঠিক কতখানি দূরে। মুখে বললে—"হট করে কিছু ভেবে নেওয়াটা ঠিক নয়, মিস্টার ক্রেস্ট। মুখ সামলে কথা বলবেন। বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন আজ রাতে। এখনো যে চোয়াল খুলে দিই নি, এই যথেষ্ট। মাতাল কোথাকার। যান, শুয়ে পড়ুন।"

"আরে, আরে! বলে কি লোকটা!" বলতে বলতে পকেট থেকে একটা রুপোর হুইসল বার করলেন মিস্টার ক্রেস্ট। "এক পা এগোলেই ফুঁ দেব। বাঁশি একবার বাজলেই তোমার দেহটা রেলিং টপকে গিয়ে পড়বে সমুদ্রে। তারপর জাহাজটাকে পেছিয়ে এনে ঘুরন্ত প্রপেলার দুটো চালিয়ে দেওয়া হবে তোমার পেটের ওপর দিয়ে। গাঁট্টাগোট্টা মাঝিমাল্লা কেন জাহাজে রাখি, এবার বুঝেছো? মাথায় ঢুকেছে তো? ত্যাঁদড়ামো না করে এসো, ফের বন্ধু হয়ে যাই। মাণিক", আঁকশির মত আঙ্গুল বেঁকালেন মিস্টার ক্রেস্ট— "এসো, শোবার সময় হয়েছে।"

ভয়ার্ত হরিণীর মত গোঁৎ খেল লিজ। পিশাচ স্বামীর বাহুর তলা দিয়ে এক দৌড়ে উধাও হল ভেতরে।

"কিছু মনে কোরো না, কেমন?" বলে, মিস্টার ক্রেস্টও পিছু নিলেন অর্ধাঙ্গিনীর। শক্ত চোখে চেয়ে রইল বণ্ড। দেখল, শোবার ঘরে ঢুকে আলো নিভিয়ে দিলেন মিস্টার ক্রেস্ট।

শাওয়ারে বেশ করে স্নান করে আধঘণ্টা পরে ডেকে এল বণ্ড। খোলা ডেকে শুতে বড় আরাম। তাই গাদা করা একটা ডানলো-পিলো গদী টেনে নিয়ে বিছানা পাতছে, এমন সময়ে নারীকণ্ঠের

আর্ত চীৎকার ভেসে এল মিস্টার ক্রেস্টের শোবার ঘর থেকে। নিঃসীম যাতনায় ককিয়ে উঠেছে লিজ।

বিছানা ফেলে দৌড়োলো বণ্ড। ওর শোবার ঘরের দরজায় হাত দিয়েও হাত সরিয়ে নিল। করছে কি বণ্ড? দাম্পত্য কলহে সে কেন নাক গলাচ্ছে? মিস্টার ক্রেস্ট মূর্তিমান পিশাচ; তাঁকে যদি লিজ এই ভাবে সহ্য করে যায় তো বণ্ডের এত মাথাব্যথা কেন? অসহ্য হলে লিজ খতম করে দিক না শয়তানটাকে—বণ্ডের তাতে কী?

ফিরে আসছে বণ্ড, এমন সময়ে আর্ত চীৎকারটা আর একবার শোনা গেল। এবার আরো নিস্তেজ।

এ অবস্থায় ঘুম আসে না। তবুও ঘুম এল। আকাশের তারা দেখতে দেখতে কখন জানি ঘুমিয়ে পড়েছিল বণ্ড। কিন্তু কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল মাত্র ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই—নাক ডাকার বিপুল শব্দে।

বোট-ডেকে দোলনা-বিছানায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছ মিস্টার ক্রেস্ট। পোর্ট ভিক্টোরিয়া থেকে রওনা হবার পর দ্বিতীয় রাত থেকেই বোট ডেকে শোয়া ধরেছেন উনি। স্পীডবোট আর ডিঙিনৌকোর মাঝে দোলনা-বিছানা খাটিয়ে টেনে ঘুমোন। কিন্তু কোনোদিন নাক ডাকে না। তাই আজকের নাসিকা গর্জনের বহর শুনেই বোঝা যাচ্ছে, আকণ্ঠ মদের ওপর খানকয়েক ঘুমের বড়িও পড়েছে নিশ্চয়।

কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করল বণ্ড। কিন্তু ঘুম কি ছাই আসে মুহুর্মুহু ঐ গর্জন শোনার পর! তিতিবিরক্ত হয়ে শেষকালে উঠে পড়ল। ভাবল বিছানা নিয়ে গিয়ে ফাইডেল বার্বের কেবিনে শোবে মেঝের ওপর। পরের দিন সকালে গায়ের ব্যথায় হয়ত আর ঘাড় তুলতে হবে না, কিন্তু কি আর করা যায়।

ঠিক এমনি সময়ে মাথার ওপরে বোট-ডেকে একটা ভারী বস্তু আছড়ে পড়ল ধড়াম করে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁচড় পাঁচড়ের আওয়াজ

আর মারাত্মক ঘড়ঘড়ানি—যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে কারো। মিস্টার ক্রেস্ট কি দোলনা-বিছানা থেকে পড়ে গেলেন ঘুমের ঘোরে?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বোট-ডেকের সিঁড়িতে পা দিল বণ্ড। কানে ভেসে এল আর একটা শব্দ। আরও ভয়ানক শব্দ। একজোড়া গোড়ালী খটাখট শব্দে উধাও হল দূরে। ডেকের পাটাতনে পলায়-মান শব্দের অর্থ কি, বণ্ডের তা অজানা নয়।

লাফিয়ে শেষ কয়েকটা ধাপ উঠল বণ্ড। দেখল, ফুটফুটে চাঁদের আলোয় চিৎপাৎ হয়ে পড়ে মিস্টার ক্রেস্ট। কাছে গিয়ে বসল হাঁটু গেড়ে। যা দেখল, তা অবিশ্বাস্য। দেহ মন শিউরে উঠল সে দৃশ্য দেখে। কী ভয়ানক!

দম আটকানো সেই বিকট মুখের দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। দাঁতের ফাঁক দিয়ে বাইরে লটপট করছে লাল-কালো একটা বস্তু। মিস্টার ক্রেস্টের জিভ ওটা নয়। মাছের ল্যাজ! হিলডাব্র্যাণ্ডের ল্যাজ!

মারা গেছেন মিস্টার ক্রেস্ট। মারা গেছেন অতি ভয়ানকভাবে। নিশ্চয় হাঁ করে ঘুমোচ্ছিলেন ভদ্রলোক। সেই সময়ে মাছটাকে কেউ ঠেসে দিয়েছে মুখের মধ্যে। মরিয়া হয়ে হয়তো উনি টেনে বার করতেও গিয়েছিলেন। কিন্তু সুতীক্ষ্ণ শলাকার মত দুপাশের পাখনা আরো গেঁথে গিয়েছে গালে—চামড়া ফুটো হয়ে বেরিয়ে এসেছে রক্তাক্ত মুখের আশপাশ দিয়ে। কী কদাকার কুৎসিতই না দেখাচ্ছে! আবার শিহরিত হল বণ্ড। মৃত্যু এসেছে মিনিটখানেকের মধ্যেই। ভয়ংকর সেই মিনিটের কল্পনায় রোমাঞ্চিত হল বণ্ড।

অদূরে সারি সারি সাজানো কাঁচের জার। দুষ্প্রাপ্য নমুনাগুলো জারে ডুবিয়ে রাখা হয় ফরম্যালিনের মধ্যে। একটি জারের পলিথিন ঢাকনি মেঝেতে পড়ে—ভেতরের নমুনাটি উধাও। ঢাকনিটা আঙুলের ডগা দিয়ে সন্তর্পণে তুলল বণ্ড, তেরপলে মুছে নিয়ে ফের ঢাকা দিল জারের মুখ।

গিয়ে দাঁড়াল লাশের পাশে। খুনী কে? ফাইডেল বার্বে, না, লিজ ক্রেস্ট? খাবার টেবিলে বংশের কেচ্ছা নিয়ে ফাইডেল বার্বেকে মিস্টার ক্রেস্ট বিদ্রূপ করেছিলেন। ফাইডেল তখন ঘুসি মারে নি। পরে নিশ্চয় ফন্দী এঁটেছে। আর লিজ? অত্যাচারী স্বামী নিধনের অভিনব এ পন্থা বোধকরি কেবল ওর মাথাতেই আসতে পারে। দুষ্প্রাপ্য মাছ দিয়ে দুর্বৃত্ত স্বামী হত্যা!

কিন্তু এ যে চরম হঠকারিতা। তদন্ত হবেই। হলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে। বণ্ড নিজেও জালে জড়িয়ে পড়বে।

কাজেই নিজেকে বাঁচানোর জন্যে লাশ পাচার করা দরকার এখুনি। বোট-ডেকের দুপাশে সিঁড়ি। ওপাশে ইঞ্জিন ঘরের আওয়াজে পাইলট নিশ্চয় কিছু শোনেনি। হেঁট হয়ে দেখল বণ্ড। চারফুট নীচে আপার ডেক। মাত্র তিনফুট চওড়া প্যাসেজের পরেই দুফুট উঁচু রেলিং। তারপর সমুদ্র। জিনিসটাকে এমন ভাবে সাজাতে হবে, যেন দোলনা ছিঁড়ে পড়ে গেছেন মিস্টার ক্রেস্ট, তারপর গড়িয়ে গিয়ে নীচের ডেক আর রেলিং টপকে তলিয়ে গেছেন সমুদ্রে।

সেলুন থেকে ছুরী এনে দোলনার দড়ি কাটল বণ্ড। এমনভাবে শুঁয়ো বার করে রাখল যেন দেখলেই মনে হবে ছিঁড়ে গেছে দড়ি। মেঝেতে রক্তের দাগ মুছল। কাঁচের জার থেকে দোলনা পর্যন্ত ফরম্যালিন পড়েছিল মেঝেতে, তাও মুছল। লাশটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে রাখল বোট-ডেকের কিনারায়। সিঁড়ি বেয়ে এল নীচের ডেকে। লাশের তলায় দাঁড়িয়ে আলগোছে নিষ্প্রাণ বপুটাকে টেনে আনল কাঁধের ওপর। মাতালের মতই হাত-পা এলিয়ে রইল দেহটা। সমুদ্রের দিকে ফিরে রেলিং টপকে ছুঁড়ে দিল। ঝপাৎ শব্দে হারিয়ে গেলেন মিস্টার ক্রেস্ট। শেষবারের মত চাঁদের আলোয় দেখা গেল, রক্তমাখা পাখনা-গাঁথা সেই বিকট মুখচ্ছবি।

ওৎ পেতে রইল বণ্ড। আওয়াজটা কারো কানে গেলে নিশ্চয়

আসবে ওপরে। কিন্তু কেউ এল না। অর্থাৎ মিস্টার ক্রেস্টের সলিলসমাধি কারো নজরে আসেনি।

শেষবারের মত বোট-ডেকে ঘুরে এল বণ্ড। ছুরী সমেত ফরম্যালিন আর রক্তে মাখা ভিজে ন্যাকড়াটা ছুঁড়ে দিল সমুদ্রে। নেমে এসে শুল ডানলোপিলোয়। ঘড়িতে তখন সওয়া দুটো। দশ মিনিট যেতে না যেতেই ঘুমিয়ে পড়ল অকাতরে।

সন্ধ্যে ছটা নাগাদ নর্থ পয়েন্টে ফিরে এল 'ওয়েভক্রেস্ট'। ডেকে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল ওরা তিনজন—বণ্ড, ফাইডেল বার্বে আর লিজ। মাঝে দাঁড়িয়ে লিজ। সাদা ফ্রকে কালো বেল্ট, গলায় সাদা-কালো রুমাল। শোকের পোশাক। তিনজনেই উদগ্রীব নিজের নিজের গোপন কথা বলার জন্যে, কিন্তু মুখ খুলছে না কেউই। কাজেই আবহাওয়া রীতিমত থমথমে। সেদিন সকালে যেন তিনজনে ষড়যন্ত্র করে বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছিল। বেলা দশটার রোদ্দুরে চোখ খুলেছিল বণ্ড। স্নান সেরে গিয়ে দেখেছিল, ফাইডেল বার্বে তখনো ঘুমিয়ে কাদা। মদের নেশা নাকি কাটতেই চাইছে না। ঘুম ভাঙার পরেই অবশ্য সবার আগে মনে পড়েছিল, মদের টেবিলে মিস্টার ক্রেস্টের রূঢ় বচন আর ফ্যামিলি কেচ্ছা নিয়ে টিট্কিরি। বলেছিল, একদিন না একদিন নোংরা মুখটা জন্মের মত বন্ধ করে ছাড়বে কেউ।

লক্ষণ দেখে ঠিক ধরতে পারেনি বণ্ড ফাইডেলই খুনী কিনা। খাবার ঘরে গিয়ে নিজেই প্রাতরাশ সাজিয়ে খেতে বসেছে, এমন সময়ে এল লিজ। চোখের কোলে কালি। না বসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেতে লাগল প্রাতরাশ। মুখচ্ছবি কিন্তু অত্যন্ত শান্ত, ধীর এবং সহজ। ঘুম এত দেরীতে ভাঙল কেন? কালরাতে ঘুমের বড়ি গিলেছিল যে।

এগারোটা বাজল। অথচ দুই মক্কেলই এড়িয়ে যাচ্ছে মিস্টার ক্রেস্টের প্রসঙ্গ। একটা জলজ্যান্ত মানুষের নিষ্ঠুর নিধন নিয়ে কেউই

কথা বলতে চায় না দেখে নিরুপায় হয়ে বণ্ড বললে—"ব্যাপার কি, মিস্টার ক্রেস্ট কোথায় ?"

ভুরু কুঁচকে লিজ বললে—"কোথায় আর, নাক ডাকাচ্ছেন বোট-ডেকের দোলনা-বিছানায়।"

ফাইডেল বার্বে বললে—"পাইলট হাউসেও যেতে পারেন।"

বণ্ড বললে—"এখনো বোট-ডেকে নাক ডাকানো মানে রোদ্দুরে রোস্ট হওয়া।"

লিজ বললে—"তাও তো বটে। যাই গিয়ে দেখি।" বলে পা দিল বোট-ডেকের সিঁড়িতে। কয়েক ধাপ উঠেই থমকে গেল। উদ্বিগ্ন গলায় বললে—"জিম, উনি তো নেই এখানে। দোলনা-বিছানা ছিঁড়ে ঝুলছে।"

বণ্ড বললে—"ফাইডেলের কথাই ঠিক। দেখি পাইলট হাউসে।"

কিন্তু পাইলট হাউস কেন, সারা জাহাজেও খুঁজে পাওয়া যায়নি মিস্টার ক্রেস্টকে, দোলনা-বিছানা যখন ছেঁড়া, তখন নিশ্চয় উনি ঘুমের ঘোরেই গড়িয়ে গিয়ে তলিয়ে গেছেন সমুদ্রে। ভয়ংকর পরিণতিটা মুখ ফুটে বলার সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল লিজ।

ক্যানন পয়েণ্ট ঘুরে এগোলো 'ওয়েভক্রেস্ট'। বণ্ড দেখল ওদের দিকেই আসছে কাস্টমস লঞ্চ। আগুনের মত খবরটা ছড়িয়ে পড়বে এখুনি।

লিজ বলল—"নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি। জিম, এত ঝামেলা সামলাতে পারব না। আপনি সঙ্গে থাকুন।"

"আছিই তো," বলল বণ্ড।

ফাইডেল বার্বে বললে—"ঘাবড়াবেন না, এরা আমার বন্ধু। চীফ জাসটিস আমার কাকা। একটা স্টেটমেণ্ট দিতে হবে সবাইকে। কাল হয়তো একটা তদন্ত হবে। রেহাই পাবেন পরশু।"

"তাই নাকি?" ঘামের ফোঁটা চকচক করে ওঠে লিজের চোখের নীচে। "এ ঝামেলা মিটলে আর এক ঝামেলার শুরু। কোথায় যে যাব, তাই জানি না। জেম্‌স, আপনি তো মোম্বাসা যাচ্ছেন। এক সাথেই যাওয়া যাবে, কেমন?"

সিগারেট ধরিয়ে দ্বিধার ভাবটা গোপন করার চেষ্টা করল বণ্ড। চার-চারটে দিন সুন্দর বজরায় সুন্দরীর সাথে অবস্থান মন্দ নয়। কিন্তু মাছের সেই ল্যাজটা! মিস্টার ক্রেস্টের মুখবিবরে ঠাসা সেই মাছটার দৃশ্য যে ভোলা যায় না কিছুতেই! কাজটা কার? লিজের? না, ফাইডেলের? কাকা আর বন্ধুদের হাতের খেলায় পার পেয়ে যাবে, এই বিশ্বাস নিয়ে হয়ত ফাইডেলই কাজটা সেরেছে।

কাষ্ঠহাসি হাসল ফাইডেল—"ব্র্যাভো, মাই ফ্রেণ্ড। আপনার মত কপাল হলে আমি বর্তে যেতাম। কিন্তু মনটা খুব খচ খচ করছে শুধু একটা ব্যাপারে। মাছটার কথা ভেবেছেন? মস্ত ঝুঁকি কিন্তু। আমেরিকার সেই মিউজিয়াম থেকে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম এলে কি খুব স্বস্তি পাবেন? ভয়ানক নাছোড়বান্দা তো আমেরিকানগুলো। মাছ না পাওয়া পর্যন্ত জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে।"

চকমকির মত কঠিন হয়ে ওঠে বণ্ডের চোখ। একথার মানে একটাই। হত্যাকারী লিজ। ফাইডেল নয়।

কিন্তু টলমলে দীঘির মত সুন্দর দুটি চোখ বারেকের জন্যও কাঁপল না। সোজা তাকালো ফাইডেলের পানে। সহজ সুন্দর গলায় বলল লিজ—"হিলডাব্র্যাণ্ড বৃটিশ মিউজিয়ামে যাবে।"

বণ্ডের চোখের ভুল হতে পারে, কিন্তু স্বেদবিন্দু যেন এবার রূপসীর ব্রহ্মতালুতেও চকচক করে উঠল না?

শুরু হল ইঞ্জিনের গুমগুম শব্দ। ঝনঝন করে নোঙরের শেকল নামল শান্ত উপসাগরে।

৫

একান্ত গোপনীয়

জ্যামাইকার সবচাইতে সুন্দর পাখী হল ডক্টর হামিংবার্ড। কেউ কেউ বলে সারা পৃথিবীতে নাকি এর চাইতে সুন্দর পাখী আর নেই। ডক্টর হামিংবার্ডের আর এক নাম, স্টীমার টেল। পুরুষ পাখীরা লম্বায় ৯ ইঞ্চি। তার মধ্যে সাত ইঞ্চি শুধু পুচ্ছ। দু'টো লম্বা কালো পালক আড়াআড়িভাবে বেঁকে পড়ে থাকে একটা অপরটার ওপর। পালকের ভেতরকার কিনারায় ঈষৎ বক্রতা—শামুক ডিজাইন—প্রান্তদেশ সামান্য ঢেউখেলানো। মাথা আর ঝুঁটি মিশমিশে কালো; ডানা গাঢ় সবুজ; দীর্ঘ চঞ্চু হলদে মিশানো উজ্জ্বল লাল; চোখ ঝকঝকে, আস্থা জাগানো কুচকুচে কালো। দেহ পান্না সবুজ। এমন ঝলমলে যে বুকে রোদ্দুর পড়লে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মনে হয়, এর চাইতে উজ্জ্বল সবুজ বুঝি ধরিত্রীর আর কোথাও নেই। জ্যামাইকায় প্রিয় পাখীদের আটপৌরে নাম দেওয়ার রেওয়াজ আছে। তাই 'ট্রোকিলাস পলিটমাস'কে 'ডক্টর বার্ড' নামে ডাকা হয়। কারণ আর কিছুই নয়। এ পাখীর দুপাশে টানা কালো পালকদুটো দেখলেই ডাক্তারের কথা মনে পড়ে। সেকেলে ডাক্তার। পরণে কালো ঝুল-অলা কোট।

ডক্টর বার্ডদের দুটো পরিবারকে বিশেষ করে ভালবাসতেন মিসেস হ্যাভলক। বিয়ের পর 'কনটেন্টে' আসার পর থেকেই এদেরকে উনি দেখেছেন। দুটো পরিবারের ভালবাসা, বাসা বাঁধা, কোঁদল করা আর মধু খাওয়া—সবই দেখেছেন। মিসেস হ্যাভলকের বয়স

এখন পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। ইতিমধ্যে তুই পরিবারের অনেকেই এসেছে, অনেকেই গেছে। আদিতে এসেছিল তুটি জুটি ; পিরামাস আর থিসবি, ড্যাফনিস আর কোলি ছিল ওদের আটপৌরে নাম। নামকরণ করেছিলেন মিসেস হ্যাভলকের শ্বাশুড়ী। তারপর থেকেই সব জুটিরই ঐ একই নাম থেকে গিয়েছে। মিসেস হ্যাভলক চা খেতে বসে তাকিয়ে ছিলেন পিরামাসের দিকে। চওড়া ঠাণ্ডা বারান্দায় চায়ের আয়োজন সাজানো। সে আয়োজন দেখবার মত। চায়ে চুমুক দিতে দিতে মিসেস হ্যাভলক দেখছিলেন রণংদেহী পিরামাসকে। কারণ, ড্যাফনিস পিরামাসের এক্তিয়ারে গোঁৎ খেয়ে ঢুকেছে মধুর লোভে, নিজের এলাকার মধু লুটে পুটে নেওয়ার পর। তুটো কালো-সবুজ পুঁচকে ধূমকেতুর মত মাঠ ছেড়ে শূন্যে উড়ল ওরা। মাঠভরা হিবিসকাস আর বোগেনভিলার রঙচঙে ফুলের ওপর উড়তে উড়তে উধাও হল আঙুর আর কমলার কুঞ্জবনের দিকে। মিসেস হ্যাভলক জানেন, ওরা ফের আসবে। তুই পরিবারে এই যে ঝটাপটি, এ আর কিছুই নয়—খেলা। মধুর লোভে নয়—কেননা এত বড় বাগানে মধু যা আছে, তাতে সবারই অভাব মেটে।

চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন মিসেস হ্যাভলক। 'পাটুম পেরিয়াম' স্যাণ্ডউইচ তুলে নিয়ে বললেন—"সত্যি, ওদের দেখলে ভয় হয়, ভালও লাগে।"

'ডেলী গ্লীনার' কাগজের ওপর দিয়ে তাকালেন কর্ণেল হ্যাভলক, "কাদের কথা বলছো ?"

"পিরামাস আর ড্যাফনিস।"

"তা যা বলেছো," নামগুলো অবশ্য একটু বোকা-বোকাই মনে হল কর্ণেলের। মুখে বললেন—"মনে হচ্ছে এবার আসরে নামবে বাটিস্‌টা। ক্যাসট্রো চাপ দিয়েই চলেছে—কমানোর লক্ষণ নেই। আজ সকালে বারক্লেতে চ্যাপ বলছিল এর মধ্যেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা

বাজারে আসছে। সহজ টাকা নয়, হুমকি দেওয়া টাকা। বেলেয়ার নাকি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। দাম শুনলে চক্ষু চড়কগাছ হবে। যে-বাড়ী আসছেবারের বড়দিনের মধ্যেই লাল পিঁপড়ের ঢিপি হয়ে দাঁড়াবে, সেই বাড়ী সমেত গরু ভেড়া চরবার মাঠের হাজার খানেক বিঘের দাম কিনা দেড়লাখ পাউণ্ড! নিজেরা কিনছে না—অন্যের নামে কেনাচ্ছে। যেমন ধরো, রাতারাতি মাথা না বিগড়োলে কেউ বিদিগিচ্ছিরি ব্লু হারবার হোটেল কেনে না। এমন কথাও শুনছি যে জিমি ফারকুয়ারসনও নাকি নিজের জায়গাজমি বেচবার খদ্দের পেয়ে গেছে। পানামা রোগে যে জমি ছেয়ে গেছে—সে জমিরও খদ্দের জোটে!"

"উরসুলা বর্তে যাবে জমি বিক্রি হয়ে গেলে। বেচারী আর টিঁকতে পারছে না এখানে। তবে কিউবার লোকজন গোটা দ্বীপটা কিনে নেবে, এটাও তো ভাল ঠেকছে না। টিম, এত টাকা ওরা পাচ্ছে কোত্থেকে?"

"লুঠতরাজ, সমিতির ফাণ্ড, সরকারী টাকা—ভগবান জানে আর কি। চোর ডাকাতে তো ছেয়ে গেছে দেশটা। কিউবা থেকে চটপট টাকা বার করে এনে কোথাও না কোথাও সে-টাকা খাটাতে না পারা পর্যন্ত ওদের স্বস্তি নেই। ডলার পালটানোর সুযোগ জ্যামাইকায় আছে। বেলেয়ার যে কিনেছে, বলতে গেলে সে সুটকেশ ভর্তি টাকা উপুড় করে দিয়েছে আসচেনহিমৃস্-এর অফিসে। আমার তো মনে হয় লোকটা বছর খানেক কি দুয়েক জমি ধরে রাখবে। গোলমাল মিটে গেলে বা ক্যাসট্রো এসে গেলে ফের বেচবে জমি। কিছু লোকসান হয় হোক, টাকাটা তুলে নিয়ে সরবে অন্য কোনো চুলোয়। মন খারাপ হয়ে যায়। বেলেয়ারের মত এমন ভাল জমিজমার শেষে এই হাল হল। ফ্যামিলির কেউ মনে করলে এ জমি কিনে নিলেই পারত।"

"বিলের ঠাকুরদার আমলে জমির আয়তন ছিল কিন্তু দশহাজার একর। ঘোড়ায় চড়ে সীমানা পেরোতে লাগত ঝাড়া তিন দিন", বললেন মিসেস হ্যাভলক।

"মোটা টাকা পেলেই বিল খুশী। এতক্ষণে বোধহয় লণ্ডনের টিকিট কেটেও বসেছে। আদি বাসিন্দাদের আর একজন সরল। দুদিন বাদে কেউ থাকবে না—আমরা ছাড়া। ভাগ্য ভাল, জুডির মন বসে গেছে এখানে।"

"তাতো বটেই," বললেন মিসেস হ্যাভলক। বলে, ঘণ্টা বাজালেন। চায়ের বাসনপত্র এবার নিয়ে যাক। ড্রইংরুম থেকে আগাথার পেছন পেছন এল ফেপ্রিন্স। আগাথা নিগ্রো মেয়ে। নীলচে কালো রঙ। মস্ত বপু। মাথায় সাদা কাপড়ের সাবেকী ঘোমটা। এ-ধরণের মাথা-ঢাকা আজকাল আর দেখা যায় না; তবে জ্যামাইকার আশপাশের অঞ্চলে রেওয়াজ এখনো থেকে গিয়েছে। আগাথা হ্যাভলক পরিবারের ঘরসংসার দেখাশুনা করে।

আর ফেপ্রিন্স? মেয়েটি এসেছে পোর্ট মেরিয়া থেকে। সাদা চামড়া আর কালো চামড়ার মিলনে বর্ণসংকর। দেখতে বেশ ছিম্‌ছাম। ফেপ্রিন্স আগাথার কাছে ঘরসংসার দেখাশুনার কাজ শিখছে।

মিসেস হ্যভলক বললেন—"আগাথা, বোতল-ভরা সুরু করা যাক। এ-বছর পেয়ারা একটু আগেই উঠেছে দেখছি।"

নির্বিকার মুখে আগাথা বলল—"আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু বোতল যে আরো চাই।"

"কেন? গত বছরেই তো হেনরিক্‌স্ থেকে সেরা বোতল দু ডজন এনে দিলাম।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু কিছু বোতল চুরমার হল এই সেদিন।"

"সেকী! কে ভাঙল?"

"তা তো জানি না," রুপোর ট্রে তুলে নিয়ে মিসেস হ্যাভলকের মুখের ভাব দেখতে লাগল আগাথা।

জ্যামাইকাতে ভাঙচুর যে হামেশাই ঘটে এবং নষ্টামির মূল যে চিরকালই নিপাত্তা থাকে, মিসেস হ্যাভলক দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তা শিখেছেন। কাজেই আর কথা না বাড়িয়ে খুশী উজ্জ্বল কণ্ঠে শুধু বললেন—"যাক গে, যা যাবার গেছে। এবার কিংসটন গেলে আরো কয়েকটা বোতল এনে দেব'খন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," বলে বাড়ির ভেতর উধাও হল আগাথা—পেছনে তরুণী ফেপ্রিন্স।

মিসেস হ্যাভলক এবার সেলাইয়ে মন দিলেন। আঙ্গুল চলতে লাগলেন যন্ত্রের মত। চোখ রইল 'জাপানীজ হ্যাট' আর 'মাংকি ফিডল'-এর মস্ত ঝোপের দিকে। পুরুষ পাখীদুটো ফিরে এসেছে। খানদানী কায়দায় ল্যাজ তুলে ফুলের ঝোপের এদিকে-ওদিকে ঘুরছে। সূর্য দিগন্তে হেলেছে। থেকে থেকে সবুজের ঝলক দেখা যাচ্ছে। চোখ যেন ধাঁধিয়ে যাচ্ছে ভারী সুন্দর সেই ঝলকে। গাছের মগডালে বসে একটা পাখী সান্ধ্য-সংগীত শুরু করেছে। ক্ষণস্থায়ী বেগুনী গোধূলির সূচনা শোনা যাচ্ছে গেছো-ব্যাঙের কটকটানিতে।

পোর্টল্যাণ্ড-এর ব্লু মাউন্টেনের একেবারে পূব অঞ্চলে 'ক্যানড্‌ল্‌ ফ্লাই পীক' পাহাড়ের সানুদেশে বিশ হাজার একর জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই 'কনটেণ্ট'। হ্যাভলক পরিবারে 'কনটেণ্ট' এসেছে পুরস্কার স্বরূপ। রাজা চার্লস্‌-এর মৃত্যুদণ্ডে অনেকে সই দিয়েছিলেন—এঁদের একজন ছিলেন জনৈক হ্যাভলক। সেই আদি হ্যাভলক 'কনটেণ্ট' পুরস্কার পান অলিভার ক্রমওয়েলের কাছ থেকে। তিনশ বছর ধরে আবাদী জমিজমা সামলে এসেছে হ্যাভলকরা দ্বীপের অন্যান্য বাসিন্দাদের মতই। কত ঝড় এসেছে, ভূমিকম্প ঘটেছে; কোকো, চিনি, আঙুর, কমলা, নারকেলে জমি ভরে উঠেছে। এখন

কলার সময়, গরু ভেড়া চরানোর যুগ। দ্বীপের যে-কটা প্রাইভেট সম্পত্তি আছে, তার মধ্যে সব চাইতে সমৃদ্ধ হল 'কনটেন্ট'। এত ভাল তত্ত্বাবধানও কোথাও নেই। বাড়ীটাও দো-আঁসলা টাইপের। ভূমিকম্পে ভেঙেছে, ঝড়ে ধূলিসাৎ হয়েছে—আবার গড়ে উঠেছে। মাঝখানের সাবেকী বাড়ীটা অবশ্য পালটায়নি। মেহগনী কাঠের থাম, পুরোনো পাথরের দোতলা বাড়ী। দুপাশে একতলা ছাউনী। জ্যামাইকার বিশেষ ধরণের চওড়া ঝোলানো ছাদ। রুপোলী দেবদারুর পাতলা তক্তা দিয়ে ছাওয়া। হ্যাভলক পরিবার প্রাতরাশ খেতে বসেছিলেন মাঝের বাড়ীর টানা চওড়া বারান্দায়। বারান্দার সামনেই বাগান। ঢালু বাগান যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে শুরু হয়েছে নিবিড় জঙ্গল। বিশ মাইল ব্যাপী জঙ্গল। প্রান্তে সমুদ্র।

'গ্লীনার' নামিয়ে রাখলেন কর্ণেল হ্যাভলক। বললেন—"গাড়ীর আওয়াজ শুনলাম মনে হচ্ছে।"

মিসেস হ্যাভলক দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—"পোর্ট অ্যানটোনিওর ফেডেন্স্রা এলে চটপট বিদেয় কোরো বাপু। ইংলণ্ড নিয়ে ওদের নাকিকান্না আর সইতে পারি না। গতবার তো মদে চুরচুর না হওয়া পর্যন্ত ওঠবার নাম করেনি। রাতের খাবার জুড়িয়ে হিম হয়ে গিয়েছিল খেয়াল আছে?" বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস। "আমি যাই। আগাথাকে দিয়ে বলে পাঠাবো সাংঘাতিক মাথা ধরেছে।"

ড্রইংরুমের দরজায় আবির্ভূত হল আগাথা। মুখের ভাব এমনি যেন এই মাত্র একহাত টেণ্ডাই মেণ্ডাই হয়ে গেছে। গা ঘেঁসে এল আরও তিনটে লোক। ঝটিতি বলল আগাথা—"কিংসটন থেকে এসেছেন। কর্ণেলকে দরকার।"

পুরোধা ব্যক্তি আগাথাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এল। মাথায়

তখনো পানামা টুপী। কিনারাটা যেন বড্ড বেশী তুমড়ে উঁচু করা। বাঁ হাত দিয়ে টুপী নামিয়ে পেটের কাছে রাখল লোকটা। রোদ চিক্‌মিক করে উঠল চুলের ক্রীম আর গালভরা দেঁতো হাসিতে। এগিয়ে এল লোকটা। হাত বাড়িয়ে দিল কর্ণেলের দিকে। বলল, —"আমি মেজর গোনজালিস। আসছি হাভানা থেকে। কর্ণেল, নমস্কার নিন।"

উচ্চারণটা অদ্ভুত। জামাইকার ট্যাক্সি ড্রাইভাররা যেমন কথাবলায় আমেরিকান ঢং নকল করে, অনেকটা তেমনি। কর্ণেল হ্যাভলক উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। মেজরের প্রসারিত হাত আলতো করে শুধু ছুঁলেন উনি। ঘাড়ের ওপর দিকে দৃষ্টিকে নিক্ষেপ করলেন পেছনের তুজনের দিকে। দরজার তুপাশে দাঁড়িয়েছিল ওরা। তুজনেরই হাতে তুটো নতুন হোল্ডঅল। প্যান আমেরিকান বিমানযাত্রীরা যে ধরনের ব্যাগ রাত্রে ব্যবহার করে—অবিকল তাই। কর্ণেলের চোখের সামনেই হোল্ডঅল তুটো মেঝেতে নামিয়ে ফের সিধে হয়ে দাঁড়ালো তুজনে। দেখে শুনে মনে হল তুটো ব্যাগেই গুরুভার কিছু রয়েছে। ভাল করে তুজনের দিকে তাকালেন কর্ণেল। মাথায় চ্যাটালো সাদা ক্যাপ। কপালে টানা চক্ষুস্ত্রাণ স্বচ্ছ আর সবুজ। তাই সবজে ছায়া পড়েছে হনুর ওপর। পায়ে হলদেটে জুতো। সবুজ ছায়ার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত পাশব তুই চোখ নিবদ্ধ মেজরের প্রতিটি নড়াচড়ার ওপর।

"আমার তুই সেক্রেটারী", বলল মেজর।

পকেট থেকে পাইপ বার করলেন কর্ণেল। তামাক ঠাসতে শুরু করলেন। নীল-নীল চোখ রইল মেজর আর তার তুই সেক্রেটারীর ওপর। মেজরের চোখা-চোখা পোশাক, ঝক্‌ঝকে জুতো, আঙুলের চক্‌চকে নখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। অপর তুজনের নীল রঙা জীন আর ক্যালিপসো শার্টও নজর এড়ালো না। মনে মনে ফন্দী

আঁটতে লাগলেন, কি কায়দায় এদের স্টাডিরুমে ড্রয়ারে রাখা রিভলবারের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায়।

মুখে বললেন—"বলুন কি করতে পারি?" বলে, পাইপ ধরিয়ে নিলেন। ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে নিরীক্ষণ করলেন মেজরের চোখ আর মুখ।

ত্বহাত ত্বপাশে ছড়িয়ে দিলেন মেজর গোনজালিস। কান এঁটো করা হাসি কিন্তু অম্লান রইল। প্রায়-সোনালী টলটলে তুই চোখে কৌতুক খেলে গেল। বলল আপন করে নেওয়া সুরে—"কাজটা স্রেফ ব্যবসা নিয়ে, কর্ণেল। হাভানার এক বিশেষ ভদ্রলোকের আমি প্রতিনিধি। শক্তিমান ভদ্রলোক। চমৎকার মানুষ," আন্তরিকতা ফুটে ওঠে মেজরের হাবভাবে, "আপনার ভালই লাগবে। উনিই পাঠিয়েছেন আমাকে আপনার জমিজমার দর জানবার জন্যে।"

মিসেস হ্যাভলক এতক্ষণ সবিনয় আধা-হাসি নিয়ে মেজরের কথা শুনছিলেন। এবার স্বামীর গা ঘেঁসে দাঁড়ালেন। মেজর যাতে অপ্রস্তুত না হন, তাই গলায় হৃদ্যতা টেনে এনে বললেন—"মেজর, প্রস্তাবটা খুবই লজ্জাকর। এত ধূলো মাড়িয়ে এতটা পথ এলেন এই কথা বলতে! আপনার বন্ধুর উচিত ছিল আগে চিঠি লেখা; অথবা কিংসটনের কাউকে বা গভর্ণমেণ্ট হাউসের কোনো অফিসারকে জিজ্ঞেস করা। তিনশ বছর হল আমার স্বামীর পরিবার এখানে রয়েছে। কাজেই 'কনটেণ্ট' বেচবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আপনার শক্তিমান বন্ধুর মাথায় অদ্ভুত এই ধারণা এলো কোত্থেকে জানি না।"

বাতাসে মাথা ঠুকে ছোট্ট অভিবাদন জানাল মেজর। হাসি মুখ ফিরল কর্ণেলের পানে। কথা বলল এমন সুরে যেন মিসেস হ্যাভলক মাঝখানে কোনো কথাই বলেন নি,—"আমার বন্ধুটি শুনেছেন, জ্যামাইকায় যে-কটা সেরা এসৃটেট আছে, 'কনটেণ্ট' তাদের অন্যতম। মানুষ

হিসেবে আমার বন্ধু কিন্তু দারুণ উদার। যে-কোনো ন্যায্য দাম আপনি হাঁকতে পারেন।”

কর্ণেল হ্যাভলক দৃঢ় গলায় শুধু বললেন—“মিসেস হ্যাভলক যা বললেন, তা শুনেছেন নিশ্চয়। এ সম্পত্তি বিক্রি হবে না।”

হেসে ফেলল মেজর গোনজালিস। অকপট হাসি বলেই মনে হল। এমন ভাবে মাথা নেড়ে মুখ খুলল যেন মাথামোটা দুগ্ধপোষ্য বালককে কিছু বোঝানো হচ্ছে,—“কর্ণেল বোধ হয় আমাকে ঠিক ধরতে পারেন নি। কনটেণ্ট ছাড়া জ্যামাইকার আর কোনো সম্পত্তি কেনার অভিপ্রায় আমার বন্ধুর নেই। কিছু টাকা ওঁর আছে। বাড়তি টাকা অবশ্য। সেই টাকাই খাটাতে চান জমিজমা কিনে। জ্যামাইকায় ডেরা বাঁধতেও চান।”

ধীর গলায় বললেন কর্ণেল—“বুঝলাম। আপনার সময় নষ্ট করার জন্যেও দুঃখিত। আমার জীবদ্দশায় ‘কনটেণ্ট’ বিক্রি হবে না। এখন আসতে পারেন। আমাদের আবার সকাল সকাল ডিনার খাওয়ার অভ্যেস।” বাঁ দিকের বারান্দা দেখিয়ে—“এদিক দিয়ে যান, কাছেই গাড়ী পাবেন। চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।”

সবিনয়ে এগোলেন কর্ণেল। কিন্তু মেজরকে অবিচল দেখে থমকে গেলেন। নীল-নীল চোখে তুহিন-কাঠিন্য সেই প্রথম দেখা গেল।

মেজর গোনজালিসের দেঁতো-হাসিতেও এবার বুঝি একটা দাঁত কম দেখা গেল। দুই চোখে হুঁসিয়ার দৃষ্টি আরো বাড়ল। হাবভাব কিন্তু সেই রকমই হাসিখুশি। গলাতেও উজ্জ্বলতা, “দাঁড়ান, মশাই, দাঁড়ান,” বলেই, সংক্ষিপ্ত হুকুম ছুঁড়ে দিল কাঁধের ওপর দিয়ে। হ্যাভলক দম্পতি শুধু দেখলেন, দাঁতের ফাঁক দিয়ে নির্গত মাত্র কটি কাটা কাটা হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে খসে গেল খুশীর মুখোস। এবং সেই প্রথম একটু অস্বস্তি বোধ করলেন মিসেস হ্যাভলক। আরও সরে দাঁড়ালেন স্বামীর পাশে।

লোকদুটো নীলরঙা প্যান-আমেরিকান থলি তুলে নিয়ে এগিয়ে এল সামনে। হাত বাড়াল মেজর গোনজালিস। একে একে টান পড়ল জীপার চেনে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হয়ে গেল থলির মুখ। দুটো ব্যাগই মার্কিন ডলারে ঠাসা। থরে থরে সাজানো বাণ্ডিলের পর বাণ্ডিল। আবার দুহাত দুপাশে ছড়াল মেজর গোনজালিস—"একশ ডলারের নোট। আসল—জাল নয়। পাঁচলক্ষ ডলার। আপনাদের টাকার হিসেবে অবশ্য একলক্ষ আশীহাজার পাউণ্ড। রাতারাতি কুবের হওয়াও বলতে পারেন। কর্ণেল, দুনিয়ায় আস্তানা বাঁধবার মত ভাল জায়গার অভাব নেই। আমার বন্ধু মনে করলে আরও হাজার বিশ জুড়ে দু'লাখ পাউণ্ডই দিতে পারেন। এক সপ্তাহের মধ্যে জানান কি করবেন। দলিলপত্র বলতে তো কিছু নেই। শুধু এক তা কাগজে আপনি সই করে দিন, বাকীটা আইনবিদরা করে নেবেন।" আবার সেই হাসি। "রাজী তো? আপনি হ্যাঁ বললেই থলিদুটো রেখে বিদেয় হই। আপনিও ডিনার খেয়ে নিন।"

আগের মত ক্রোধ আর বিতৃষ্ণা মিশোনো চোখে তাকিয়ে রইলেন হ্যাভলক দম্পতি। যে-কেউ দেখলেই কল্পনা করে নিত পরের দিন কি ভাবে ফলাও করে আসর মাৎ করছেন মিসেস হ্যাভলক। বলছেন —"বেঁটে বন্ধু ছ্যাঁচড়া দুশমন! টাকাঠাসা নোংরা দু'দুটো থলি! টিমির সে কী রাগ! মুখের ওপর বলে দিল,—বাপুহে, টাকা নিয়ে কেটে পড়ো চটপট!"

নিঃসীম বিরক্তিতে মুখ নামিয়ে নিলেন কর্ণেল হ্যাভলক। বললেন —"ভেবেছিলাম কথায় ফাঁক রাখিনি। কোনো দামেই এ সম্পত্তি বিক্রি হবার নয়। আমেরিকান ডলারের ওপর আর সবার মত মোহও আমার নেই। এখন বিদেয় হোন।" বলে, এমন ভঙ্গিমায় টেবিলে পাইপ নামিয়ে রাখলেন কর্ণেল যেন এবার আস্তিন গুটোবেন।

সেই প্রথম মেজর গোনজালিস-এর হাসির হলকা উধাও হল। দেঁতো-হাসিতে ঠোঁট ফাঁক হয়ে থাকায় অবশ্য দাঁতখিঁচুনির ভাবটাই প্রকট হল। টলটলে সোনালী দুই চোখে সহসা ফুটে উঠল তাম্র কাঠিন্য। নরম গলায় শুধু বলল—"কর্ণেল, আপনার কথায় ফাঁক ছিল না, ছিল আমার কথায়। আমার বন্ধুর শেষ কথাটা এখনো বলা হয় নি। যে-কোনো দামে আপনি রাজী না হলে পরবর্তী পথ ধরতে যেন দ্বিধা না করি, এ নির্দেশও আছে আমার ওপর।"

আচম্বিতে বড় ভয় পেলেন মিসেস হ্যাভলক। কর্ণেলের বাহুতে হাত রেখে চাপ দিলেন সজোরে। আশ্বাস দিলেন কর্ণেল স্ত্রীর হাতে হাত রেখে। বললেন চিবিয়ে চিবিয়ে—"মেজর, আর হামলা করবেন না, যান। নইলে পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব।"

গোলাপী জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট চেটে নিল মেজর গোনজালিস। নিভে গেল মুখের সব আলো। চোখে-মুখে এখন কেবল নির্দয় নির্মমতা। বলল কর্কশ গলায়—"আপনার জীবদ্দশায় তাহলে এ সম্পত্তি বিক্রি হবার নয়, কর্ণেল, এই কি আপনার শেষ কথা?" বলেই, ডান হাত পেছনে বাড়াল মেজর, মৃদুশব্দে তুড়ি দিল, মাত্র একবার। পেছনের দুই চেলার হাত পৌঁছোলো খোলা সার্টের মধ্যে দিয়ে কোমরের কাছে। ধারালো পাশব দুই চোখ নিবদ্ধ মেজরের তুড়ি দেওয়ার দুটি আঙুলের ওপর।

সভয়ে মুখে হাত রাখলেন মিসেস হ্যাভলক। 'হ্যাঁ' বলতে গেলেন কর্ণেল, কিন্তু শুকনো গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না। ঢোক গিললেন সশব্দে। বিশ্বাস করতে মন চাইল না। এও কি সম্ভব? নিজের বাড়ীতেই খুন করার হুমকি? না, না। নিশ্চয় ধাপ্পা মারছে কিউবা-আগত কাঠখোট্টা কসাইদুটো। তাই কোনো মতে অস্পষ্ট গলায় বললেন—"হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা।"

ছোট্ট করে মাথা হেলিয়ে সায় দিল মেজর গোনজালিস। বলল

—"তাহলে সম্পত্তির পরবর্তী মালিকের সঙ্গেই কথা বলবেন'খন আমার বন্ধু। মানে, এবার কথা হবে আপনার মেয়ের সঙ্গে।"

সঙ্গে সঙ্গে তুড়ি-ধ্বনি শোনা গেল দুই আঙুলে। সামনে থেকে পাশে সরে দাঁড়াল মেজর গোনজালিস—গুলিবর্ষণের সুবিধের জন্য। দুই স্যাঙাতের ঝকঝকে শার্টের নীচ থেকে বেরিয়ে এল দু' দুটো বাদামী রঙের বাঁদুরে হাত। কদাকার-দর্শন শশার মত চেহারার ধাতব নলচে দুটো থর থর করে কেঁপে উঠল, গর্জে উঠল অবরুদ্ধ শব্দে। নিষ্প্রাণ দেহদুটো মেঝেতে আছড়ে পড়ার পরেও স্তব্ধ হল না গুলিবর্ষণ।

অবশেষে হেঁট হল মেজর গোনজালিস। কোথায় কোথায় বুলেট বিঁধেছে পরখ করল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর ক্ষিপ্রচরণে খর্বকায় তিন ব্যক্তি ঢুকল গোলাপী-সাদা ড্রইংরুমে, সেখান থেকে কারুকাজ করা মেহগনী হলঘর, সবশেষে জমকালো সদর দরজা। চৌকাঠ পেরিয়ে আর তাড়াহুড়ো করল না তিন মূর্তি। ধীরে সুস্থে উঠে বসল কালোরঙের ফোর্ড কনসাল সিডান গাড়ীতে। নাম্বার প্লেট জ্যামাইকার। মেজর গোনজালিস বসল চালকের আসনে। পেছনের আসনে দুই বন্দুকধারী। রয়াল প্মামের সুদীর্ঘ বীথির মধ্যে দিয়ে ঢিমেতালে গড়িয়ে চলল মস্ত ফোর্ড। বীথি যেখানে পোর্ট অ্যান-টোনিওর রাস্তায় মিশেছে, সেখানে দেখা গেল টেলিফোনের কাটাতার ঝুলছে গাছের ডাল থেকে ঝিকিমিকি লিয়ানা লতার মত। পিচঢাকা রাস্তায় না পৌঁছোনো পর্যন্ত এবড়োখেবড়ো ঢালু পথে খুব সন্তর্পণে স্টীয়ারিং ধরে রইল মেজর। তারপর শুরু হল গতিবৃদ্ধি। জোড়া খুনের ঠিক বিশ মিনিট পরে গাড়ী পৌঁছোলো বন্দরের বাইরে। চোরাই গাড়ীটা লুকোনো হল রাস্তার ধারে ঘাসের আড়ালে। সেখান থেকে স্বল্পালোকিত পথে সিকি মাইল হেঁটে তিন বাঁটুল পৌঁছোলো জেটিতে। প্রতীক্ষমাণ স্পীডবোটের চালু ইঞ্জিন ভুট-ভুট

করে বুদবুদ কাটছিল জলে। তিন মূর্তি উঠে বসতেই শান্ত জল তোলপাড় করে এগুলো জলযান। জনৈক মার্কিন মহিলা-কবি যে বন্দরকে বিশ্বের সুন্দরতম বন্দর নাম দিয়েছেন, সেই বন্দরের জল ছলছলিয়ে উঠল মোটর বোটের দৌরাত্ম্যে। অদূরে ভাসছিল পঞ্চাশ-টন ওজনের ক্রিসক্র্যাফ্‌ট্ জাহাজ। গোধূলির আভায় ঝিলমিল করছিল ধাতব দেহ। নোঙর আধতোলা। ওপরে উড়ছিল মার্কিণ পতাকা। দু' দুটো ঝকমকে আন্তেনার শিক দেখেই বোঝা যায় এ জাহাজ টুরিস্ট-জাহাজ, এসেছে হয় কিংসটন নয় মণ্টেগু বে থেকে। তিন বাঁটকুল ডেকে উঠতেই স্পীডবোটকে ঝুলিয়ে টেনে তুলে নেওয়া হল ওপরে। দুটো ক্যানো ঘুরপাক খাচ্ছিল জাহাজের আশপাশে—ভিক্ষা চাইছে। মেজর গোনজালিস একটা পঞ্চাশ সেণ্ট ছুঁড়ে দিতেই ন্যাকড়াপরা লোকদুটো ক্যানো ছেড়ে ডুব মারল জলে মুদ্রার খোঁজে। গরগর করে উঠল জোড়া ডিজেল-ইঞ্জিন। শুরু হল যাত্রা। ভোরের আগেই যাত্রা শেষ হবে হাভানায়। তীর থেকে জেলেরা দেখল রাজহাঁসের মত জল কেটে এগিয়ে চলেছে টুরিস্ট-জাহাজ। তর্ক বিতর্ক শুরু হয়ে গেল জাহাজের যাত্রীদের নিয়ে। নিশ্চয় কোনো ফিল্মস্টার জ্যামাইকায় ছুটি কাটিয়ে দেশে ফিরছে।

'কনটেণ্টে'র চওড়া বারান্দায় সূর্যের শেষ কিরণ যেন থমকে দাঁড়াল রক্তের দাগের ওপর। একটা ডক্টর বার্ড রেলিং পেরিয়ে এসে মিসেস হ্যাভলকের নিস্পন্দ হৃদ্‌পিণ্ডের খুব কাছে কি যেন নিরীক্ষণ করল। পরক্ষণেই উড়ে গেল হিবিসকাসের ঝোপে।

ছোট্ট স্পোর্টস গাড়ীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সশব্দে মোড় ফিরছে গাড়ীটা। মিসেস হ্যাভলক বেঁচে থাকলে এখুনি চেঁচিয়ে উঠতেন—"জুডি, অনেকবার বলেছি ওভাবে মোড় ঘুরিসনি। বড় কাঁকর ছিটকোয়। ঘাসকাটা মেসিনের দফারফা হচ্ছে শুধু তোর জন্যেই।"

* * *

একমাস পরের ঘটনা। লণ্ডন শহর। অক্টোবর মাস। ঝিকিমিকি গ্রীষ্মের পর শীতের সবে শুরু। রিজেণ্ট পার্কে ঘাসকাটার যন্ত্র চলছে। শব্দ ভেসে আসছে 'এম' এর অফিসঘরের খোলা জানালা দিয়ে। ঘাস কাটার এ যন্ত্র মোটরে চলে। জেমস বণ্ড তাই ভাবছিল সাবেকী আমলের মেশিনের ট্যাংট্যাং লোহার আওয়াজ চিরতরে বুঝি বিদায় নিচ্ছে ধরিত্রীর শব্দ-জগৎ থেকে।

সাতপাঁচ ভাববার অবকাশ পেয়েছিল বলেই আবোল-তাবোল চিন্তা করেছিল জেমস বণ্ড। 'এম' কাজের কথায় যেন এসেও আসতে পারছেন না। প্রথমে বণ্ডকে জিজ্ঞেস করা হল, হাতে কোনো কাজ আছে কিনা। বণ্ড জানিয়েছিল, হাত খালি। খুশীমনে প্রত্যাশাও করেছিল নতুন কাজ। একটু উত্তেজনাও বোধ করেছিল সম্বোধন শুনে। অফিস টাইমে ডিউটিতে থাকার সময়ে 'এম' কখনো নাম ধরে ডাকেন না। তখন জেমস বণ্ডের নাম, 007। কিন্তু আজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। 'এম' বণ্ডকে নাম ধরে ডেকেছেন। হয়ত এবারের কাজে ব্যক্তিগত কিছু আছে। হয়ত হুকুম নয়, অনুরোধ করবেন 'এম'। বণ্ড নিজেও লক্ষ্য করল, 'এম'-এর সাংঘাতিক স্বচ্ছ, ধূসর, তুহিন-শীতল চোখের আকাশে যেন বাড়তি একটা উদ্বেগ ভাসছে। তাছাড়া, ঝাড়া তিন মিনিট ধরে এক নাগাড়ে পাইপ খাওয়াও যেন কেমনতর।

চেয়ার ঘুরিয়ে বসলেন 'এম'। দেশলাইয়ের বাক্স জোরে টেবিলে নিক্ষেপ করলেন। লাল চামড়ার ওপর দিয়ে হড়কে গেল বাক্সটা—এল বণ্ডের সামনে। বণ্ড খপ করে ধরে ফের ফিরিয়ে দিল টেবিলের মাঝে। 'এম' হাসলেন। মনস্থির হয়েছে মনে হল। বললেন—"জেমস, আমাদের সকলেই জানে কার কি কাজ, তাই না? কিন্তু আমি বড় একা।"

ভুরু কুঁচকে বণ্ড বলল—"বুঝেছি, অ্যাডমিরালকে হুকুম দিতে

হয়। তাই তিনি একা। বাকী সবাই শুধু হুকুম তামিল করেই খালাস।”

পাইপ নামালেন ‘এম’—“গোড়ায় একজনকে মজবুত হতেই হবে। সে শুধু ঠিক করবে এবার কি করণীয়। চল্লিশের পর মজবুত থাকা যায় না। তখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার অনেকে ভগবানের কাঁধে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে। এরা কিন্তু জীবনযুদ্ধে হেরে যায়। কষ্ট পায়, ট্র্যাজেডী ঘটে, অসুখে ভোগে। জেমস, বিপজ্জনক সে বয়স এখনো তোমার আসেনি। তুমি এখনো মজবুত—দেহে এবং মনে। কতখানি মজবুত, সে হিসেব জানা আছে?”

প্রশ্নটা নেহাতই ব্যক্তিগত, মোটেই পছন্দ হল না বণ্ডের। কি জবাব দেওয়া যায়, ভেবে পেল না। বণ্ডের বউ নেই, ছেলেপুলেও নেই। ট্রাজেডী কি জিনিস, তা সে জানে না, ব্যক্তিগত কোনো ক্ষতিও কোনোদিন হয় নি। দারুণ কোনো অসুখ বিসুখও কখনো হয়নি। কতখানি মজবুত হলে এসবের সঙ্গে মহড়া দেওয়া যায়, বণ্ড তা জানে না। তাই দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে শুধু বলল—“ইয়ে, ব্যাপারটা কি জানেন, কাজ যাই হোক না কেন, কারণটা যদি ন্যায্য হয়, তাহলে যে কোনো শক্ত অবস্থায় খাড়া থাকবার ক্ষমতা আছে।”

“দেখলে তো”, অধীর কণ্ঠ ‘এম’-এর, “…তুমিও আমার হুকুমের প্রত্যাশায় বসে, আমি যা বলব, তার এক পা-ও বাইরে যাবে না। কিন্তু হুকুম আমাকেই করতে হবে। আমাকেই ভাবতে হবে কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়,” বলতে বলতে সামলে নিলেন নিজেকে। “কি আর করা যায়। আমার চাকরীই তো তাই।” বলে, ঘন ঘন পাইপে টান দিয়ে ঠাণ্ডা হওয়ার চেষ্টা করলেন।

‘এম’-এর জন্যে দুঃখ হল বণ্ডের। নিজের গুরুদায়িত্ব নিয়ে এই প্রথম ‘এম’-কে ভেঙে পড়তে দেখল সে। নিশ্চয় ‘এম’-এবার নিজেই কোনো ঝামেলায় পড়েছেন। কিন্তু কিসের ঝামেলা? রাজনৈতিক

নয় নিশ্চয়। মন্ত্রীমহলের ভ্রূকুঞ্চনের তোয়াক্কা রাখেন না উনি। হয়ত ব্যক্তিগত কিছু। বণ্ড শুধোলো—"স্যার, আমাকে দিয়ে কিছু হবে কি ?"

বণ্ডের দিকে বারেক তাকিয়ে ঘুরন্ত চেয়ার জানলার দিকে ফেরালেন 'এম'। মেঘরাজ্যের দিকে তাকিয়ে সহসা শুধোলেন—"হ্যাভলকের কেসটা মনে পড়ে ?…"

"কাগজে পড়েছিলাম। জ্যামাইকার প্রবীন দম্পতি। একরাত্রে মেয়ে বাড়ী ফিরে দেখল দুজনেই গুলিতে ঝাঁঝরা। কানাঘুষো শোনা গিয়েছিল, আততায়ীরা খুব সম্ভব হ্যাভানার গুণ্ডা। সংসার যে দেখাশুনা করে, সে মেয়েটি বলেছিল, তিনটে লোক এসেছিল গাড়ীতে। দেখতে কিউবার লোকেদের মত। গাড়ীটা চোরাই গাড়ী। সেই রাতেই বন্দর থেকে একটা বজরা প্যাটার্নের জাহাজ রওনা হয়েছিল। পুলিশ হালে পানি পায়নি। স্যার, আর জানি না। এ কেস আমার কাছে পাঠানোই হয়নি।"

"না পাঠানোর কারণ ছিল। কেসটা আমার ব্যক্তিগত এখতিয়ারের। তাই কারো হুকুম ছিল না এ নিয়ে মাথা ঘামানোর।" গলা সাফ করে নিলেন 'এম'। "হ্যাভলক দম্পতি আমার বন্ধু-স্থানীয়। ওদের বিয়েতে আমি 'বেস্টম্যান' ছিলাম ; ১৯২৫ সালে মাল্টায় বিয়ে করেছিল ওরা।"

"অ।"

"হ্যাভলকরা লোক ভাল। স্টেশন সি-কে বলেছিলাম একটু চোখ রাখতে। কিন্তু বাটিসটা স্যাঙাতদের টিকিও ছুঁতে পারল না। অথচ ক্যাসট্রো এখনো রয়েছে। ক্যাসট্রোর গুপ্তচরে তো সরকারী দপ্তর ছেয়ে গেছে। হপ্তা দুয়েক আগে সব শুনলাম। হ্যাভলকদের খুন করিয়েছে ভন হ্যামারস্টাইন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে জাল ছিঁড়ে যে কটা নাৎসী গা-ঢাকা দিয়েছিল, ভন হ্যামারস্টাইন তাদের

অন্যতম। ভন হ্যামারস্টাইনের গুণের সীমা নেই। লোকটা আগে ছিল হিটলারের গুপ্ত পুলিশ গেস্টাপোতে। বাটিসটার চাকরীতে বহাল হয়ে সেই কাজই মন দিয়ে করেছে হ্যামারস্টাইন। অর্থাৎ চর-চক্র উৎখাত। ব্ল্যাকমেল জাতীয় অনেক কুকীর্তির পর টাকাও জমিয়েছে বিস্তর। বেশ জমিয়ে বসেছিল, কিন্তু ক্যাসট্রোর জয় জয়কারে আসন টলেছে। সবার আগে চম্পট দেওয়ার প্ল্যান করল হ্যামারস্টাইন। কিউবার বাইরে টাকা পাঠাতে লাগল। জমিজমা কিনে পাপের টাকা লগ্নী করতে সুরু করল। এ কাজের ভার রইল যে অফিসারের ওপর তার নাম গোনজালিস। দু'দুটো খুনে স্যাঙাৎ অষ্টপ্রহর আগলে বেড়ায় গোনজালিসকে। গোনজালিসের কাজই হল সব চাইতে ভালো সম্পত্তি চড়া দামে কেনা। হ্যামারস্টাইনের টাকার অভাব নেই। কুবুদ্ধিরও অভাব নেই। তাই টাকার প্রলোভন ব্যর্থ হলে, গোনজালিস খোকাখুকুদের গায়েব করেছে, বিষের পর বিষে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে, ছলে-বলে-কৌশলে মালিকের সুবুদ্ধির উন্মেষ ঘটিয়েছে। জ্যামাইকার অন্যতম সেরা সম্পত্তির মালিকানা হ্যাভলক দম্পতির। হ্যামারস্টাইনের চোখ পড়েছিল সেদিকে। গোনজালিসও এসেছিল। খুব সম্ভব হ্যামারস্টাইনের হুকুম ছিল, মিষ্টিকথায় বেচতে না চাইলে যেন হ্যাভলকদের পরপারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর চাপ দেওয়া একমাত্র মেয়ে জুডির ওপর। মেয়ের বয়স এখন পঁচিশ। তারপর যা হবার হয়েছে। গোনজালিস হ্যাভলকদের রক্তে হাত রাঙিয়ে হাওয়া হয়েছে। হপ্তা দুয়েক আগে হ্যামারস্টাইনকে বরখাস্ত করেছে বাটিসটা। কুকীর্তির দুএকটা নমুনা কানে গিয়েছিল বোধহয়। সেই থেকে হ্যামারস্টাইন উধাও। সঙ্গে গিয়েছে তিন চ্যালা। ভাল সময়েই গেছে। কেননা ক্যাসট্রো এল বলে।"

"গেছে কোথায়?" ধীর গলা বণ্ডের।

"আমেরিকায়। উত্তর ভার্নমণ্টে। ক্যানাডিয়ান বর্ডারের ধারে-

কাছেই। 'একো হ্রদ' বলে একটা জায়গা আছে। চারপাশে পাহাড়। মাঝে লেক। লোকজন আসার বালাই নেই। মোটা টাকায় পুরো জায়গাটা ভাড়া নিয়েছে হ্যামারস্টাইন।"

"খবরটা পেলেন কার কাছে।"

"এডগার হুভারকে কেস রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম। হুভার একে চেনে। মিয়ামি থেকে ক্যাসট্রো পর্যন্ত গুলিগোলার বহরে ও ব্যতিব্যস্ত। মার্কিন মুলুকের লুঠতরাজি টাকার স্রোত হ্যাভানার জুয়া আর নাচের আড্ডায় আসবার পর থেকেই হ্যাভানা নিয়ে টনক নড়েছে হুভারের। ওর কাছেই খবর পেলাম, ছ'মাসের মেয়াদে দেশ দেখার ভিসা নিয়ে আমেরিকায় এসেছে হ্যামারস্টাইন। হুভারের খুব উৎসাহ দেখলাম ওকে জ্যামাইকায় চালান দেওয়ার। মামলা দাঁড় করানোর মত মালমশলা হাতে আছে কিনা জানতে চাইল। আমি এখানকার অ্যাটর্নী জেনারেলের সঙ্গে কথা বলে দেখলাম, হ্যাভানা থেকে সাক্ষী না আসা পর্যন্ত ওকে জ্যামাইকায় পাঠানো যাবে না। সে গুড়েও বালি। হ্যাভানা থেকে কেউই আসবে না। সরকারী ভাবে কিউবা এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। হুভার সব শুনে বলল, তাহলে ওর ভিসা বাতিল করা যাক। আমি রাজী হইনি।"

পাইপ নিভে গিয়েছিল 'এম'-এর। জ্বালিয়ে নিয়ে ফের শুরু করলেন—"পাহাড় অঞ্চলের কমিশনারকে ধরতে উনি একটা টহলদারী প্লেন পাঠিয়ে দিলেন একো লেক অঞ্চলের সীমানা বরাবর। প্লেন যা দেখবার সব দেখে এসেছে। অন্যান্য সাহায্যও ওঁর কাছে পাওয়া যাবে। এবার ভাবছি, কি করব। সে ভাবনা তো আমারই।"

এতক্ষণে বণ্ড বুঝল, কেন 'এম' এত উদ্বিগ্ন। কেন উনি মীমাংসায় পৌঁছোনোর ভারটা নিজের কাঁধে না রেখে অন্যের কাঁধে রাখতে চান। নিহত ব্যক্তিরা 'এম'-এর বন্ধু। হত্যাকারীর নামও জানেন 'এম'। এক্ষেত্রে খুনীর বিচারের ভার তিনি নিতে পারেন না। কোনো

বিচারকই নিতে পারেন না। পরিস্থিতিতে রায় দিতে হবে এমন একজনকে যে হ্যাভলকদের চেনে না, হ্যামারস্টাইনকে জানে না।

বণ্ডই সেই ব্যক্তি। 'এম' চাইছেন বণ্ড রায় দিক। দণ্ডের ভারও নিজের হাতে তুলে নিক। হ্যামারস্টাইন জংলী আইন প্রয়োগ করেছিল নিরীহ অসহায় দুটি বয়োবৃদ্ধ মানুষের ওপর। ও অপরাধের সমুচিত শাস্তির বিধান একমাত্র জংলী আইনেই আছে। প্রতিহিংসা চিরকালই প্রতিহিংসা—সেখানে মায়া-দয়া নেই।

বণ্ড বলল—"স্যার, নির্দ্বিধায় বলছি, রক্তের বদলে রক্ত চাই। বিদেশী গুণ্ডাদের শায়েস্তা করতে হলে ইংলিশ দাওয়াইয়ের চাইতে মিষ্টিমধুর আর কিছু নেই।"

চেয়ে রইলেন 'এম'। উৎসাহ বা মন্তব্য—কোনোটাই ধ্বনিত হল না নীরব কণ্ঠে।

বণ্ড বলল—"ফাঁসী নয়, এদের খুন করা দরকার।"

বণ্ডের দিকে আর তাকালেন না 'এম'। ক্ষণেকের জন্য শূন্য দৃষ্টি যেন ধাবিত হল অন্তরের অন্দরে। এরপর হাত বাড়ালেন ওপরের ড্রয়ারের ভেতরে। বেরুলো একটা পাতলা ফাইল। ওপরে যথাবিধি কিছুই লেখা নেই। অত্যন্ত গোপনীয় ফাইলের পরিচিত চিহ্ন সেই লাল তারাও নেই।

এবার বেরুলো একটা রাবার স্ট্যাম্প আর প্যাড। প্যাডে স্ট্যাম্প টিপে ফাইলের কোণে ছাপ দিলেন 'এম'। তারপর ফাইল এগিয়ে দিলেন বণ্ডের দিকে।

জ্বল জ্বল করতে লাগল রক্তরঙা স্যানসেরিফ টাইপ।

"ফর ইওর আইজ অনলি", অর্থাৎ, একান্ত গোপনীয়।

কথা বলল না বণ্ড। নীরবে সায় দিল। ফাইল তুলে নিয়ে মার্জার চরণে নিষ্ক্রান্ত হল ঘর থেকে।

* * *

দু'দিন পরে শুক্রবারের কমেট প্লেনে মনট্রিয়ল পৌঁছোলো জেমস বণ্ড। কমেটে আকাশে উড়তে মোটেই ভাল লাগে না বণ্ডের। বড্ড উঁচুতে ওড়ে, ছোটেও শব্দের আগে, যাত্রীও একগাদা। আহারে, মান্ধাতা আমলের স্ট্র্যাটোক্রুজারের সে-সব দিন কি আর আসবে! আটলান্টিক পেরোতেই লাগত দশঘণ্টা। ডিনার খেয়ে টেনে ঘণ্টাসাতেক নাক ডাকানো যেত বাঙ্কে। পশ্চিম দিগন্তের সোনালী আলোয় কেবিন ভরে উঠলে ধীরে সুস্থে নেমে এসে 'বি. ও. এ. সি.' মার্কা গেঁইয়া প্রাতরাশ খাওয়ার সে মজা এখন আর নেই। এখানে সব কিছুই যেন পলক ফেলতে না ফেলতে ঘটে যায়। মাত্র ঘণ্টা-দুয়েকের ঢুলুনি। আটঘণ্টায় লণ্ডন থেকে মনট্রিয়ল।

মনট্রিয়লে নেমে প্লিমাউথ সেলুন হাঁকিয়ে রয়াল কানাডিয়ান মাউণ্টেড পুলিশের সদর অফিসে পৌঁছোলো বণ্ড। জায়গাটার নাম ওটাওয়া। ধূসর রঙের পেল্লায় ইমারতের ভেতরে ঢুকে কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে চাইল। নিজের নাম বলল শুধু 'জেমস'। 'এম'-এর নির্দেশ ছিল তাই। একটা ছোকরা করপোর‍্যাল ওকে নিয়ে গেল চারতলায়। একগাদা আসবাবপত্রে ঠাসা একটি ঘরে একজন সার্জেণ্টের হাতে ওকে সঁপে দিয়ে বিদায় নিল। সার্জেণ্ট কার সঙ্গে যেন 'ইণ্টারকমে' কথা বলে নিল। তারপর মিনিট দশেক প্রতীক্ষা। অবশেষে ডাক পড়ল যে ঘরে, সে ঘরে ঢুকতেই জানলার সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়াল নীলরঙা স্যুট পরা দীর্ঘকায় এক পুরুষ। দেখে বয়স বেশী মনে হয় না। পাতলা হেসে বললে—"মিস্টার জেমস? আমার নাম কর্ণেল···ধরুন, কর্ণেল জন্স।"

করমর্দনের পর কর্ণেল বলল—"আপনাকে স্বাগত জানাতে কমিশনার নিজে হাজির থাকতে পারলেন না বলে উনি দুঃখ জানিয়েছেন। সর্দিতে কাহিল হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। কি ধরনের সর্দি বুঝতেই পারছেন," কৌতুক উজ্জ্বলিত চক্ষু কর্ণেলের। "কূটনৈতিক

ঠাট বজায় রাখতে এমনি সর্দি সকলেরই হয়। ওঁর আদেশে আপনার সেবায় আমি রইলাম। সারাদিনটা যা বলবেন, তাই করব। বুঝলেন ?"

বণ্ড বুঝল। হাড়ে হাড়ে বুঝল। কমিশনার সব সাহায্যই দেবেন—কিন্তু দস্তানা পরে। আঙুলের ছাপ কোথাও পড়বেনা—অথচ কাজ হাসিল হয়ে যাবে। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। হুঁশিয়ার হল বণ্ড।

বলল—"লণ্ডন থেকে অবশ্য শুনেই এসেছিলাম, কমিশনার নিজে এ ব্যাপারে থাকবেন না। আমার কর্তাও তা চান না। কমিশনারকে আমি চিনি না, তাঁর হেডকোয়ার্টারের ছায়াও মাড়াইনি। সুতরাং, আসুন না মিনিট দশেক প্রাণ খুলে কথা বলা যাক।"

কর্ণেল জন্স হেসে ফেলল—"নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমার ওপরেও হুকুম আছে, গাওনাটা আগে ভাগে গেয়ে নিয়ে কাজে হাত দেবার। বুঝতেই তো পারছেন, অনেকগুলো বেআইনী ব্যাপার করব আপনাতে আমাতে। বাজে ছল ছুতোয় শিকারের লাইসেন্স নেওয়া, সীমান্তের কানুন ভাঙা, সবশেষে আরও খারাপ কাজ করা। তাই না ?"

"হুবহু তাই। এখান থেকে একবার বেরোলে কেউ কাউকে চিনতেই পারবো না। জেলে আটকা পড়লে তো কথাই নেই। বলুন, এবার কি ?"

ড্রয়ার টেনে একটা ফাইল বার করল কর্ণেল। প্রথমেই রয়েছে একটা ফর্দ। পয়লা দফায় পেন্সিল ঠেকিয়ে তাকাল বণ্ডের পানে। তীক্ষ্ণ চোখ পিছলে গেল বণ্ডের সাদা-কালো কুকুরে-দাঁত প্যাটার্ণের ট্যুইড-স্যুট, সাদা সার্ট আর এক চিলতে কালো টাইয়ের ওপর দিয়ে।

বলল—"জামাকাপড়।" ফাইল থেকে বেরুল এক তা কাগজ। "নিন, পুরোনো জামাকাপড়ের দোকানের ঠিকানা এতে আছে, আর আছে একটা ফর্দ, চট করে চোখে লাগে, এমনি বাহারি পোশাকের

ধার দিয়েও যাবেন না। খাকি সার্ট, গাঢ় বাদামী জীন্স, পাহাড়ী বুট। দেখে নেবেন যাতে পরে অস্বস্তি না হয়। কেমিস্টের ঠিকানাও রইল। গেলেই বাদামী রঙ পাবেন। গ্যালনখানেক কিনবেন। বেশ করে নেয়ে নেবেন। এসময়ে পাহাড়ে বাদামী রঙ বিস্তর দেখবেন। প্যারাস্যুট কাপড়ের দরকার হবে না। ঘাপটি মারবার জন্যে বাড়তি কিছুই লাগবে না। বুঝলেন? ধরা যদি পড়েন তো দেখা যাবে জাতে আপনি ইংরেজ, কানাডায় এসেছেন শিকারের নেশায়, পথ ভুলেছেন, সীমান্ত পেরিয়েছেন। রাইফেল? বাইরের ঘরে মিনিট দশেক বসে ছিলেন আপনি। সেই ফাঁকে আমি নিজেই নীচে গিয়েছিলাম, আমার প্লিমাউথে রাইফেলটা রেখে এসেছি। নতুন মডেলের স্যাভেজ ৯৯ এফ, ওয়েদারবাই ৬×৬২' স্কোপ, ট্রিগার টিপলেই পাঁচটা গুলি বেরোবে পর-পর। ম্যাগাজিনে বুলেট থাকে এক সঙ্গে বিশটা, হাই-ভেলসিটি ·২৫০—৩.০০০। বাজারে এর চাইতে হাল্কা শিকারী রাইফেল আর নেই। ওজন মাত্র সাড়ে ছ'পাউণ্ড। আমার এক বন্ধুর রাইফেল। যে কোনো দিন ফেরৎ পেলেই চলবে। না পেলেও বন্ধুবর মন খারাপ করবে না। পরখ করে দেখেছি পাঁচশ গজ দূর পর্যন্ত এর বুলেট ছোটে। বন্দুকের লাইসেন্স।" বলে লাইসেন্সটা এগিয়ে দিল কর্ণেল—"পাসপোর্টে যে নাম দিয়েছে, লাইসেন্সও সেই নামে রইল। শিকারের লাইসেন্সও ঐ নামে। খেয়াল রাখবেন, হরিণ মারবার মরসুম এখন নয়। ছোটখাট শিকার ছাড়া বড় শিকারের ছাড়পত্রও নয় এ লাইসেন্স। ড্রাইভিং লাইসেন্স নতুন করে দিলাম। হ্যাভারস্যাক, কম্পাস—গাড়ীতে রেখে এসেছি। ভাল কথা, নিজস্ব রিভলবার কাছে আছে নিশ্চয়?"

"তা আছে। ওয়ালথার পি.পি.কে, বার্ণস মার্টিন হোল্‌সৃটর।"

"নাম্বারটা দিন। নাম্বার ছাড়া একটা লাইসেন্স আনিয়ে

রাখিয়েছি। দৈবাৎ এ রিভলবার ফেরৎ এলে ধামাচাপা দেবার পথ পরিষ্কার রইল।”

রিভলবার বার করে নাম্বারটা বলল বণ্ড। ফর্মে লিখে নিয়ে ফেরৎ দিল কর্ণেল।

“এবার, ম্যাপ। ‘এসো’ কোম্পানীর এই ম্যাপেই কাজ হবে। তল্লাটের সব কিছুই এতে পাবেন।” উঠে এসে ম্যাপটা বণ্ডের সামনে টেবিলে বিছিয়ে ধরে কর্ণেল—“১৭ নম্বর রাস্তা ধরে মনট্রিয়ল ফিরে যাবেন। তারপর ৩৭ নম্বর রুট ধরুন, সেণ্ট অ্যানির ব্রীজ পেরিয়ে ফের ধরুন ৭ নম্বর রাস্তা। পাইক নদী পৌঁছে স্ট্যান ব্রীজের কাছে নেবেন ৫২ নম্বর রুট। ফ্রেলিগ্‌সৃবার্গ পৌঁছে গাড়ী গ্যারেজে রাখুন। রাস্তা ভালই, জিরেন নিয়ে সব মিলিয়ে ঘণ্টা পাঁচেকের মোটর হাঁকানো। ঠিক আছে? খেয়াল রাখিবেন, ফ্রেলিগ্‌সৃবার্গে যেন রাত তিনটে নাগাদ পৌঁছোতে পারেন। গ্যারেজের ছোকরার ঘুম লেগে থাকবেই। গাড়ী থেকে কি-কি নামালেন, অত খেয়াল থাকবে না।” চেয়ারে ফিরে গেল কর্ণেল। এবার ফাইল থেকে বেরুলো দু-তা কাগজ। প্রথম কাগজে পেন্সিলে আঁকা একটা ম্যাপের খসড়া। দ্বিতীয়টিতে আকাশ থেকে তোলা একটা ফটোগ্রাফ।

গভীর চোখে তাকাল কর্ণেল—“বিপদ এলেই আগে পুড়িয়ে ফেলবেন কাগজ দুটো। কাজ হয়ে গেলেও পুড়িয়ে ফেলবেন।—পেন্সিলে আঁকা এই যে ম্যাপ দেখছেন, এটা একটা গোপন রাস্তা। এককালে যত খুনে গুণ্ডা বাটপাড় এপথে যাতায়াত করত—স্মাগলার। এখন ওরা স্থলপথ ছেড়ে আকাশ পথে কাজ সারে। অতএব আপনি এ পথে নিরাপদ—সেকাল হলে নির্ঘাৎ গুলি খেয়ে মরতেন। সবুজ পাহাড়ে পৌঁছোনার এই হল গোপন পথ। তারপর চড়াই ভেঙে উঠবেন উপত্যকার ওপর। এই যে ক্রশ চিহ্ন, এই খানে রয়েছে ‘একো লেক’। ছবি দেখে তো মনে হচ্ছে পূর্ব দিক থেকেই আসা উচিত।”

"দূরত্ব কত? মাইল দশেক?"

"সাড়ে দশ। ফ্রেলিগ্‌সবার্গ থেকে ঘণ্টা তিনেকের পথ। ছটা নাগাদ আসল জায়গায় পৌঁছোবেন। দিনের আলোয় ঘণ্টাখানেক। বাকী পথটুকু দেখেশুনে হাঁটবেন।" বলে, চৌকোণা ফটোগ্রাফটা এগিয়ে দিল কর্ণেল।

বণ্ড দেখল,—লণ্ডনে যে ছবি সে দেখে এসেছে, তারই মাঝের অংশ বড় করে দেখানো হয়েছে এ ছবিতে। পাথরের একসারি বাড়ী। স্লেট পাথরের ছাদ, ঝিলিমিলি জানলা, ছাউনি দেওয়া ছাদ, দরজার সামনেই ধূলোভরা রাস্তা, পাশেই গ্যারেজ আর কুকুরের ঘর। বাগানের পাশে পাথর বাঁধানো চত্বর—ফুলঝোপের বর্ডার। সামনেই দু'তিন একর সবুজ মাঠ—লেক পর্যন্ত। নকল হ্রদ। পাথরের টেবিল চেয়ার— বাগানে বসার উপযুক্ত। সাঁতারুর পাটাতন, মানে, ডাইভিং বোর্ড। জল থেকে ওঠবার মই। হ্রদের পর থেকেই জঙ্গল—খাড়াই ভাবে উঠে গেছে ওপরে। কর্ণেলের ইচ্ছে এই দিক দিয়েই হানা দেওয়ার। ছবিতে জনমানব নেই। পাথর বাঁধানো চত্বরে শুধু অনেকগুলো দামী অ্যালুমিনিয়ামের গার্ডেন ফার্নিচার্স। কাঁচের টেবিলে মদ। বণ্ডের মনে পড়ল, বড় ছবিতে টেনিস কোর্ট আর আস্তাবলও ছিল। সব মিলিয়ে একো লেক হল কোটিপতির বিশ্রামালয়। নিশ্চিন্ত মনে অ্যাটম বোমার আওতা থেকে বহুদূরে বসে শ্রান্ত মনকে চাঙা করে নেওয়ার নিকেতন। এ নিকেতন আপাতত এমন একজনের দখলে, ক্যারিবিয়ান কূটনীতিতে যে দশটি বছর ঝড় তুলেছে এবং ছমাস জিরিয়ে নিচ্ছে শক্তির ব্যাটারীতে নতুন চার্জ দেওয়ার জন্যে। হ্রদ থাকায় সুবিধেও অনেক। রক্তাক্ত হাত সহজেই ধুয়ে নেওয়া যাবে।

শূন্য ফাইল বন্ধ করল কর্ণেল জন্স। টাইপ করা ফর্দটা কুচিয়ে ফেলে দিল ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে। বণ্ডের সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গিয়ে

বললে—"আর্মিতে যখন ছিলাম, এ ধরনের ত্ব'একটা কাজ আমাকেও করতে হয়েছে। পুলিশের কাজে সে মজা নেই, পেনশনের প্রত্যাশায় হাত পরিষ্কার না রাখলেই নয়। যাক, কাগজেই খবরটা পড়া যাবে'খন।" বলে হাসল কর্ণেল—"ভাল হোক, মন্দ হোক—খবর তো!"

ধন্যবাদ জানিয়ে করমর্দন করল বণ্ড। শুধোলো—"ভাল কথা, 'স্যাভেজ' রাইফেলে কটা টান লাগে, একটা না ত্বটো? টার্গেট দেখলে এক্সপেরিমেণ্টের সময় নাও পেতে পারি।"

"একটানেই কাজ হবে। হেয়ার-ট্রিগার। টার্গেট না আসা পর্যন্ত ট্রিগারে যেন আঙুল না লাগে। তিনশ গজ পাল্লার মধ্যেও আসবেন না। শুনেছি, শয়তানগুলোর লক্ষ্য নাকি ব্যর্থ হয় না। বেশী কাছে না যাওয়াই মঙ্গল।" একহাতে পাল্লা খুলে ধরে অপর হাত বণ্ডের কাঁধে রাখল কর্ণেল, "কমিশনার একটা কথা হামেশা বলেন, 'বুলেট যেখানে পৌঁছোয়, খামোকা সেখানে মানুষ পাঠিও না।' কম্যাণ্ডার, কথাটা খেয়াল রাখবেন।"

সমস্ত রাত এবং পরের দিনটাও মনট্রিয়লের বাইরে কো-জী মোটর কোর্টে কাটাল বণ্ড। তিন রাত্রের অগ্রিম পাওনা আগেই মিটিয়ে দিল। সারা দিন গেল তোড়জোড় করতে। জিনিসপত্র দেখে শুনে নিতে হল, পাহাড়ী বুট পরে খানিকটা হাঁটতেও হল। কিছু গ্লুকোজ বড়ি, খানিকটা শূয়োরের সেঁকা মাংস আর রুটি কিনে নিজেই স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে খেল। একটা অ্যালুমিনিয়ামের বড়সড় ফ্লাস্ক কিনে তিন ভাগ ভরল হুইস্কিতে, এক ভাগ কফি দিয়ে। সন্ধ্যে হতেই ডিনার খেয়ে নিয়ে খানিকটা নিদ্রাও হল। তারপর ওয়ালনাট রঙ জলে গুলে, বেশ করে গা ধুয়ে নিল। এমন কি চুলের গোড়া পর্যন্ত রাঙানো হল রঙে। ফলে, চোখের নিমেষে রঙ পালটে গেল

জেমস বণ্ডের। যেন একটা রেড ইণ্ডিয়ান। চোখ ছুটো কেবল নীল নীল ধূসর। রাত দুপুর হতে না হতেই নিঃশব্দে পাশের দরজা খুলে গিয়ে বসল প্লিমাউথে। যথাসময়ে পৌছোলো ফ্রেলিগ্‌স্‌বার্গে।

কর্ণেল জন্স বলেছিল, গ্যারেজে সারারাত ডিউটি দেয় যে ছোকরা, ঘুমচোখে সে বেশী কিছু লক্ষ্য করবেনা। বণ্ড কিন্তু দেখল, ছোকরার চোখে ঘুমের নেশা ততটা নেই যতটা আশা করা গিয়েছিল।

"মিস্টার কি শিকারে যাচ্ছেন?"

নর্থ আমেরিকায় জবাব দেওয়ার ইচ্ছে না থাকলে হঁা, হু, হি জাতীয় কণ্ঠধ্বনি করে কাজ চালানোর রেওয়াজ আছে। বণ্ড কাঁধের রাইফেল নামাতে নামাতে বলল—"হুঁ।"

"শনিবার হাইগেট ঝরণার ধারে একটা ভারী সুন্দর বীভার মেরে আনলেন একজন।"

"তাই নাকি?" অন্যমনস্ক ভাবে বলল বণ্ড। দুরাতের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হন হন করে বেরিয়ে পড়ল গ্যারেজ থেকে। সদর রাস্তা ধরে শ'খানেক গজ হাঁটতেই ডাইনে দেখা গেল কালচে পথটা। পায়ে চলা রাস্তা সেঁধিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে। আধঘণ্টা পর পায়ে চলা পথের শেষে দেখা গেল একটা ভাঙাচোরা খামার বাড়ী। অন্ধকার বাড়ী। আলোর চিহ্ন নেই কোথাও। বাড়ী প্রদক্ষিণ করে নদীর ধারে যেতেই আবার পাওয়া গেল পথটা। এ পথে যেতে হবে মাইল তিনেক। কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। লম্বা পা চালালো বণ্ড। মিলিয়ে গেল কুকুর কণ্ঠ। নীরবতা। ডালপালার ফাঁক দিয়ে হলদেটে চাঁদের আলোয় পথ চিনে চিনে এগোলো বণ্ড। নরম নরম পাহাড়ী জুতোয় দিব্বি আরাম। ভোর চারটে নাগাদ জঙ্গল পাতলা হয়ে এল। ডাইনে দেখা গেল ফ্রাঙ্কলিনের আলো। পিচের রাস্তা পেরিয়ে ফের মেঠো পথ। ডাইনে হ্রদের ম্লান ঝিকিমিকি। পাঁচটা

নাগাদ ১০৮ ও ১২০ নম্বর সদর রাস্তা পেরিয়ে শুরু হল চড়াই ভাঙা। বেশ খানিকটা ওপরে উঠে খসড়া ম্যাপটা পুড়িয়ে ফেলল বণ্ড। আকাশে আলো ফুটছে। জঙ্গলে নাম-না-জানা পাখীর বিষণ্ণ কান্না শোনা যাচ্ছে। জন্তুরা খসখস করে পালাচ্ছে। মনের চোখে বণ্ড দেখল, পাহাড়ের ওদিকের দৃশ্য। জানলায় পর্দাটানা বাড়ীর মধ্যে ঘুমোচ্ছে চারটে রক্তলোভী মানুষ-পশু। জল্লাদ যাচ্ছে জঙ্গল পেরিয়ে চার শয়তানকে যমালয়ের রাস্তা দেখাতে।

সাত পাঁচ ভাবনা দিয়ে চার বিটলের চিন্তাকে মন থেকে সরিয়ে রাখল বণ্ড। পাহাড়ের মাথায় উঠেও নীচের উপত্যকা চোখে পড়ল না। একটু জিরিয়ে নিয়ে একটা ওক গাছের মগডালে উঠল বণ্ড। এবার চোখের সামনে ভেসে উঠল সবুজ পাহাড়ের দিগন্ত ছোঁয়া বিস্তার, পূব আকাশে সূর্যদেবের স্বর্ণগোলক, ছ'হাজার ফুট ঢালু জঙ্গলের প্রান্তে চওড়া মাঠ, হ্রদ, বাড়ী—পাতলা কুয়াশার চাদরে সব কিছুই ঢাকা।

ভোরের আলো হ্রদের জল ছুঁলো মিনিট পনেরোর মধ্যেই। দেখতে দেখতে সবুজ মাঠ আর স্লেট ছাদ ঝলমল করে উঠল অরুণাভায়। উড়ে গেল কুয়াশা। রঙ্গমঞ্চ পরিষ্কার। এবার শুরু হবে নাটক।

পকেট থেকে টেলিস্কোপ বার করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে টার্গেট দেখতে লাগল বণ্ড। ঢালু জমিও দেখল। মাঠের কিনারায় দাঁড়ালে বাড়ীর ছাদ রাইফেলের আওতার পাঁচশ গজের মধ্যেই আসে, ডাইভিং-বোর্ড আর হ্রদের তীর আসে তিনশ গজের মধ্যে। চার শয়তান কখন ঘুম থেকে ওঠে, কখন হ্রদের ধারে আসে, কখন নাইতে নামে তা যখন জানা নেই, তখন সবুর করাই ভাল। কিন্তু বেটারা সকালে ওঠে কখন?

প্রশ্নের জবাব দিতেই যেন সহসা পর্দা উঠে গেল একটা জানলা

থেকে। স্প্রিং রোলারের শব্দ অত দূর থেকেও স্পষ্ট ভেসে এল বণ্ডের কানে। অবাক হল বণ্ড। 'একো লেক' নামের তাৎপর্য এতক্ষণে বোঝা গেল। প্রতিধ্বনি হ্রদ! সামান্য আওয়াজের প্রতিধ্বনিও গম গম করে উঠে আসছে হ্রদে প্রতিহত হয়ে পাহাড় বেয়ে। ভারী আশ্চর্য তো! কিন্তু বণ্ডের নড়াচড়ার শব্দ নীচে পৌঁছোলে মুস্কিল। তবে সে সম্ভাবনা নেই। প্রতিধ্বনি হ্রদের জল থেকেই জাগছে—ওপর থেকে নীচে নামছে না।

বাঁদিকের একটা চিমনির ডগায় ধোঁয়া উঠতে শুরু করেছে। বণ্ড কল্পনা করল, নিশ্চয় মাংসর বড়া আর ডিম ভাজা শুরু হবে এখুনি। সেই সঙ্গে গরম গরম কফি। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে নেমে এল বণ্ড। কিঞ্চিৎ খাদ্য উদরে প্রেরণ করা দরকার। সর্বশেষ সিগারেটটাও নিঃশেষ করতে হবে। তারপর ফায়ারিং পয়েণ্টে নেমে-গিয়ে আরম্ভ হবে গুলিবর্ষণ।

কিন্তু রুটি আটকালো গলায়। উদ্বেগ বাড়লে যা হয় আর কি। গলা কাঠ হয়ে আসছে। কল্পনায় দেখল, 'স্যাভেজ' রাইফেল গুলিবর্ষণ শুরু করেছে। শিকারী হাউণ্ডের মত ধমকে ধমকে উঠছে। মিশ-মিশে কালো বুলেটগুলো যেন উড়ন্ত ভোমরার মত ধীর গতিতে অলসভাবে নেমে যাচ্ছে ওপর থেকে নীচে উপত্যকায় গোলাপী চামড়া লক্ষ্য করে। বুলেট বিঁধেছে চামড়ায়। ধীরে ধীরে যেন চামড়ায় টোল দেখা গেল, ছিঁড়ে গেল, ফাঁক দিয়ে টুক করে তপ্ত বুলেট প্রবেশ করল ভেতরে···আরও ভেতরে···ধীরে সুস্থে এগুচ্ছে ছন্দিত হৃৎপিণ্ডের দিকে···টিশু আর রক্ত বওয়া শিরা উপশিরা সরে সরে গিয়ে কুর্নিশ করতে করতে পথ করে দিচ্ছে বুলেটকে।

ফ্লাস্কে চুমুক দিল বণ্ড। হুইস্কি আর কফির মিশ্রণ পোঁছোলো পাকস্থলীতে, শরীর গরম হয়ে উঠছে। রাইফেলটা ফের কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে সন্তর্পণে নামতে লাগল গাছপালার ফাঁক দিয়ে। শ্যাওলা আর

ঝরাপাতার কুশনে পা রেখে রেখে এমন ভাবে নামতে লাগল যাতে কোনো শব্দ না জাগে। কিন্তু শব্দ জাগল। সমগ্র বনস্থলী ধীরে ধীরে যেন সজাগ হল বণ্ডের অনধিকার প্রবেশে। সাড়া পড়ে গেল গাছে গাছে। দুটো বাচ্চা নিয়ে ভয়ার্ত চোখে পালাল একটা হরিণী। একটা ভারী সুন্দর কাঠঠোকরা মহাসোরগোল তুলল শাখায় শাখায়। বেশ কয়েকটা ডোরাকাটা কাঠবেড়ালী দাঁত খিঁচিয়ে গলাবাড়িয়ে বেজায় লফঝম্প শুরু করল। মহা ভাবনায় পড়ল বণ্ড। নীচে নেমে যদি দেখা যায়, বন্দুকধারী কোনো প্রহরী গাছে গাছে পাখীদের অকস্মাৎ চাঞ্চল্য দেখছে অবাক চোখ তুলে, তাহলেই মুস্কিল।

কিন্তু না। সেরকম কিছুই দেখা গেল না। শেষ ওকগাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে বণ্ড শুধু দেখল, জানলায় জানলায় তখনো পর্দা নামানো। ধোঁয়া উঠছে শুধু একটা চিমনি দিয়ে।

আটটা বাজে। ঢালু মাঠের মাঝে মস্ত একটা মেপ্‌ল্‌ গাছকে মনে ধরল বণ্ডের। রোদ ঠিকরে যাচ্ছে গেরুয়া আর সিঁদুর রঙের ওপর। জামা কাপড়ের রঙের সঙ্গে দিব্বি মিশ খাবে ও গাছ। ঘাপটি মারবার উপযুক্ত জায়গা। হ্রদ আর বাড়ী, দুদিকেই নজর রাখা যাবে। গুলিও চলবে। তবে ঘাসের মধ্যে দিয়ে বুকে হেঁটে পৌঁছোতে হবে। হাওয়া বইছে। লম্বা লম্বা ঘাস নুয়ে পড়ছে। হাওয়া যতক্ষণ বইবে, ততক্ষণ বণ্ডের গতিও গোপন থাকবে। নইলে—

আচম্বিতে একটা শব্দ শোনা গেল। মট করে একটা ডাল ভাঙল বাঁদিকে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু পেতে বসে পড়ল বণ্ড। শব্দটা একবারই শোনা গিয়েছে—পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। ঝাড়া দশ মিনিট ওৎ পেতে রইল বণ্ড।

পশুপাখীরা শুকনো ডাল ভেঙে শব্দ সৃষ্টি করে না। শুকনো কাঠ বিশেষ বিপদ সংকেত বহন করে ওদের কাছে। তাই ওরা অত

হুঁশিয়ার। বসলেই মট করে ভাঙতে পারে, এমনি কোনো শাখায় পাখীরা ভুলেও বসে না। এমনি কি শিংঅলা, খুরঅলা ভারী হরিণও নিঃশব্দে বিচরণ করে বনতলে—ভয় পেলে অবশ্য দিকবিদিক জ্ঞান হারায়। তবে কি জঙ্গলেও পাহারা বসিয়েছে হ্যামারস্টাইন ?

সন্তর্পণে কাঁধ থেকে রাইফেল নামাল বণ্ড। বুড়ো আঙুল রইল সেফটি ক্যাচে।

সহসা দুটো হরিণ হেলতে দুলতে এগিয়ে গেল মাঠের দিকে। ডাল যেখানে ভেঙেছে, এল সেইদিক থেকে। শান্ত চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বণ্ড। পাহারাদার নয়, শব্দ সৃষ্টি করেছে এরাই।

ঘাসের মধ্যে দিয়ে সাপের মত বুকে হেঁটে পাঁচশ গজ যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। হাত আর কনুই তো ছড়েই, নাকে চোখে ঘাড়ে পোকামকড় ধূলোও ঢোকে এন্তার। তবুও এগোলো বণ্ড। হাওয়া বইছে। ঘাস দুলছে। হাওয়ার দুলুনিতে গোপন রইল ওর বুকে হাঁটার দরুণ ঘাসের চাঞ্চল্য।

আকাশ থেকে দেখলে মনে হত যেন মস্ত একটা উদ্‌বিড়াল ঘাসের মধ্যে দিয়ে এগুচ্ছে। না, একটা নয়—দুটো উদ্‌বিড়াল। কেননা, ঘাস-সমুদ্রে আরও একটা গোপন দুলুনি সৃষ্টি হয়েছে। পেছন থেকেই এগিয়ে আসছে আর একজন বণ্ডের মতই ঘাসের মধ্যে দিয়ে বুকে হেঁটে।

বণ্ড কিন্তু টের পায়নি কিছুই। লক্ষ্য শুধু মেপ্‌ল্ গাছের দিকে। বিশ ফুট দূরে এসে একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্য থামল। হাঁটু আর কনুই টনটন করছিল। তাই ম্যাসেজ করছে, এমন সময়ে ফিস-ফিসানি শোনা গেল বাঁদিকে—মাত্র কয়েক ফুট দূরে ঘাসের মধ্যে থেকে কে যেন চাপা গলায় কথা কইছে। শুনেই আচমকা ঘাড় ঘোরাতে গিয়ে কট করে উঠল বণ্ডের পিঠের শিরদাঁড়া।

"লাস ফেলে দেব আর এক ইঞ্চি নড়লেই," গলাটা মেয়েলী। কিন্তু হুকুমটা কঠোর—একচুলও নড়চড় হবার মত কোমল নয়।

বণ্ডের বুকের মধ্যে দুরমুস পেটা শুরু হয়ে গেল তীরের ডগা দেখে। মাত্র আঠারো ইঞ্চি দূরে ঘাসের মধ্যে থেকে মাথা তাগ করে রয়েছে নীলচে ইস্পাতের তীরের ফলা।

ধনুকটা জমির সঙ্গে সমান্তরাল করে ধরা—ঘাসের মধ্যে লুকোনো ছিলার সঙ্গে তীর ধরে আঙুলটার গাঁট পর্যন্ত সাদা হয়ে গিয়েছে। পটভূমিকায় জ্বলজ্বল করছে একজোড়া ধূসর চোখ, ঘামে চকচকে রোদে পোড়া তামাটে চামড়া। ঘাসের মধ্যে দিয়ে এর বেশী কিছু নজরে এলোনা। থুতু দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিল বণ্ড। অতি সন্তর্পণে ডান হাত এগোলো কোমরস্থ রিভলবারের দিকে। মুখে বলল অতি মোলায়েম স্বরে—"তুমি আবার কে হে?"

তীরের ডগা ভয়ঙ্কর ভঙ্গিমায় নড়ে উঠল। হিসহিসিয়ে উঠল বামাকণ্ঠ—"ডানহাত নড়াবেন না। কাঁধ ফুটো করে দেব। কে আপনি? গার্ড?"

"না। আপনি কে?"

"আহম্মক। কি করছেন এখানে?" গলার কঠোরতা ঈষৎ কমলেও উদ্বেগ কমল না। উচ্চারণ শুনে মনে হয় স্কটল্যাণ্ড বা ওয়েলস্-এর বাসিন্দা।

"হে রবিনা, তীর-ধনুকটা নামালে হয় না? নিশ্চিন্ত হয়ে কথা বলা যেত।"

"রিভলবারে হাত নেবেন না বলুন?"

"না। আপাতত ঘাসজমির ভেতর থেকে বেরুনো যাক," বলে আর দ্বিধা করল না বণ্ড। ফের কনুই আর হাঁটুর ওপর দিয়ে দেহটাকে সরীসৃপ ভঙ্গিমায় টেনে নিয়ে চলল মেপ্‌ল্ গাছের দিকে।

মেয়েটির ব্যবস্থা হবে তারপর। অগ্নিবর্ষণ শুরু হওয়ার আগেই এ মেয়েকে গুলির পাল্লার বাইরে সরাতে হবে।

গাছের গুঁড়ির কাছে পৌঁছোলো বণ্ড। উঠে দাঁড়ালো অতি সাবধানে। রোদ্দুরে জ্বলন্ত পাতার মধ্যে দিয়ে দেখল, অনেকগুলো জানালার পর্দা এর মধ্যেই সরে গেছে। খোলা উঠোনে জমজমাট প্রাতরাশের আয়োজন করছে তুজন কাফ্রী মেয়ে। অনুমান মিথ্যে হয়নি। গাছের ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লেক পর্যন্ত। কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল বণ্ড। ঘাসের মধ্যে থেকে টুক করে বেরিয়ে এল মেয়েটা, সিধে হয়ে দাঁড়ালো মেপ্‌ল্‌-এর নীচে। বণ্ডের কাছে ঘেঁসল না। হাতে তীর ধনুক, তবে ছিলে এখন ঢিলে।

মেয়েটাকে দেখতে বেশ। তবে জামাকাপড়ে চুলে শ্রী নেই, পারিপাট্য নেই। শার্ট আর ট্রাউজার্স জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া, কাদামাখা। পোশাক জলপাই সবুজ রঙের। আঁট করে বাঁধা চুল সোনালী রঙের। চোখেমুখে বুনো রূপ, উঁচু হনু, রুপো-রুপো ধূসরাভ ভৎ‌সনা মিশোনো চোখ। একটা হনুতে কালসিটে আর আঁচড়ের দাগ। আঁচড় কনুইতেও। বাঁ কাঁধে তূণভর্তি তীর। হাতে ধনুক আর কোমরের বেল্টে শিকারী ছুরী ছাড়া কার কোনো হাতিয়ার নেই। নিতম্বে একটা ছোট্ট বাদামী ক্যানভাসের ব্যাগ—খুব সম্ভব খাবারের থলি। সব মিলিয়ে এ রূপ দেখলেই মনে হয়, সুন্দরী কিন্তু বিপজ্জনক নারী। বন্য প্রকৃতির সঙ্গে মিতালি নিবিড়, জঙ্গল তার নখদর্পণে। মনে ভয়ডর নেই। জীবনপথে একলা চলার সাহস আছে। সভ্যতার সঙ্গে সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ।

চমৎকার! মনে মনে ভাবল বণ্ড। হাসল, মিহি গলায় বলল—"তোমার নাম দিলাম রবিনা হুড—রবিন হুডের মহিলা-সংস্করণ। আমার নাম জেমস বণ্ড।" ছিপি খুলে ফ্লাস্ক এগিয়ে দিয়ে—

"খাও, কফি আর আগুনজল, একসঙ্গে মিশোনো। চাও তো শুকনো মাংসও দিতে পারি। নাকি, ফল আর শিশির খাওয়া অভ্যেস?"

কাছে এল সুন্দরী। কিন্তু বসল গজখানেক তফাতে। বসার কায়দা রেড ইণ্ডিয়ানদের মত। মুখে ফ্লাস্ক উপুড় করে দিয়ে বেশ খানিকটা 'তরল আগুন' ঢালল গলায়। বিনা মন্তব্যে ফেরৎ দিল ফ্লাস্ক। হাসলও না। নেহাৎই বলতে হয়, তাই 'ধন্যবাদ' শব্দটা কোনমতে আউড়ে তীরটা গুঁজে রাখল তূণে। চোখে চোখ রেখে বলল—"চুপিসাড়ে জঙ্গলে ঢুকেছেন মনে হচ্ছে। হরিণ শিকারের মরসুম শুরু হতে এখনো তিন হপ্তা দেরী। হরিণ এখানে পাবেনও না। পেলেও সেই রাত্রে। দিনের আলোয় যদি আরো ওপরে ওঠেন, হরিণ পাবেন। গোটা দলটাই মিলবে। হদিশ আমি বলে দেব। কিন্তু শব্দ করতে পারবেন না।"

"তুমিও কি সেই মতলবে ঘুর ঘুর করছো? শিকার? দেখি লাইসেন্সটা।"

বিনা বাক্যব্যয়ে বুকপকেট থেকে এক তা কাগজ বার করে এগিয়ে দিল বনবালা। লাইসেন্সই বটে। ভারমণ্টের বেনিংটন থেকে জুডি হ্যাভলকের নামে লাইসেন্স বেরিয়েছে। একটা ফর্দর পারমিটও রয়েছে। তীর ধনুকের জায়গায় চিহ্ন দেওয়া। জুডি হ্যাভলকের বয়স পঁচিশ। জন্মস্থান, জ্যামাইকা।

ভেতরে ভেতরে চমকে উঠল বণ্ড। সর্বনাশ! মেয়েটার সাহস তো কম নয়। সহানুভূতির সুরে মুখে বললে—"জুডি, তুমি একটা মেয়ে বটে! জ্যামাইকা থেকে মাঠ বন প্রান্তর পেরিয়ে এসেছো পিতৃহত্যার শোধ নিতে ঐ তীর ধনুক দিয়ে? বলিহারি যাই তোমাকে! চীনদেশের প্রবাদটা মনে পড়ছে। প্রতিহিংসা নিতে যাওয়ার আগে, দুটো কবর একসঙ্গেই খুঁড়ে রেখো। কবর খোঁড়া সাঙ্গ করেই আসা হয়েছে নিশ্চয়?"

প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে ছিল জুডি হ্যাভলক—"কে আপনি? কি করছেন এখানে? এত কথাই বা জানলেন কি করে?"

বণ্ড ভেবে দেখল, এই জবরজঙ্গ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে হলে রূপসী বনদেবীর সঙ্গে হাত মেলানোই ভাল। উদাসভাবে বলল—"নাম তো শুনেই নিলে। আমার আবির্ভাব লণ্ডন, মানে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে। তোমার দুঃখকষ্টের ইতিহাস আমার জানা। আমি এসেছি মৃত্যুদণ্ড নিয়ে। নীচের বাড়ীর ঐ ওরা যাতে আর কোনোদিন তোমাকে না জ্বালাতে পারে, সে ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে।"

তিক্ত কণ্ঠে বলল সুন্দরী তন্বী—"আমার অত্যন্ত প্রিয় টাট্টু-ঘোড়াকে তিনহপ্তা আগে ওরা বিষ খাইয়ে মেরেছে। এইটুকু বয়স থেকে একটা অ্যালসেশিয়ানকে বড় করেছিলাম, তাকে গুলি করে খতম করেছে। তারপরেই এল একটা চিঠি: 'মরণের হাত অগুন্তি। একটা হাত উদ্যত হল তোমার শিরে। বিশেষ একটা দিনে খবরের কাগজে একটা নোটিস ছাপতে হবে আমাকে—হুকুম শিরোধার্য, জুডি'। সিধে গেলাম পুলিশ ফাঁড়িতে। তারা অভয় দিলে বিপদ এলে নিশ্চয় আগলানো হবে আমাকে। আরও বলল, ভয় দেখানো চিঠির লেখক কিউবার গুণ্ডারা বলেই মনে হয়। গেলাম কিউবাতে। সেরা হোটেলে উঠে খুব কষে জুয়ো খেলার নাচ আর জুয়োর আড্ডায়। এ বেশে অবশ্য নয়। দামী দামী পোষাক আর গয়না পরে গিয়েছিলাম। কাজেই সবাই ছেঁকে ধরল আমায়। আমিও মুখে মধু ঝরাতে লাগলাম। এমন ভান করলাম যেন রোমাঞ্চের অন্বেষণে এতদূর আসা। চোরচোট্টা আর সত্যিকারে ডাকাতগুলোর খবরাখবর নিতে আমার বড্ড শিহরণ জাগে কিনা, তাই এন্তার প্রশ্ন করি। জিজ্ঞেস করতে করতে অবশেষে খোঁজ পেলাম ঐ সয়তানের—"
তর্জনীর নির্দেশে নীচের বাড়ীটা দেখালো জুডি। "কিন্তু বীরপুঙ্গব

কিউবা ছেড়ে তখন চম্পট দিয়েছে। বাটিসটা নাকি অনেক কুকীর্তি জেনে ফেলেছিল। শত্রুও বিস্তর হয়েছে। জেনেছিলাম অনেক খবর, বাকী যেটুকু তাও উদ্ধার করলাম এক হোমরাচোমরা পুলিশ অফিসারের পেট থেকে। সে জন্যে অবশ্য," এইখানে বণ্ডের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল রূপসী, "আমাকে একটু বেশী রকমের ঢলাঢলি করতে হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে।" খানিক বিরতি। "যাক, কিউবা থেকে সোজা গেলাম আমেরিকায়। পিনকারটনরা নাকি পৃথিবীবিখ্যাত ডিটেকটিভ। মোটা টাকায় কিনলাম ঐ হতভাগার এখানকার ঠিকানা।" রূপসী বনচারিনীর চোখে আবার সেই বেপরোয়া দৃষ্টি। "এই হল আমার কাহিনী।"

"এখানে এলে কি করে?"

"বেনিংটন পর্যন্ত আকাশপথে। তারপর হেঁটে। চারদিন হেঁটেছি। সবুজ পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। অসুবিধে হয়নি। জ্যামাইকার পাহাড়ে আমার বাড়ী। এখানকার চাইতে চড়াই-উৎরাই সেখানে আরো বিপজ্জনক।"

"বেশ, এবার মতলব কি? মানে, কি করা হবে?"

"ভন হ্যামারস্টাইনকে তীর দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করা হবে। তারপর ফের হাঁটাপথে ফেরা হবে বেনিংটন," খুব সহজভাবে বলা হল কথাটা। যেন গাছ থেকে ফুল তোলার কথা হচ্ছে।

কথা বলার শব্দ ভেসে এল নীচের উপত্যকা থেকে। উঠে দাঁড়াল বণ্ড। ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখল তুজন মেয়েকে নিয়ে তিনটে পুরুষ উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসি আর কথার মধ্যে চেয়ার টেনে নিয়ে বসা হল টেবিলের সামনে। একটা চেয়ার শূন্য। এ চেয়ারের তুপাশে বসে মেয়ে তুটি। চেয়ারের অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়—টেবিলের মাথার দিকে।

টেলিস্কোপ বার করল বণ্ড। লেন্সের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল

কালচে রঙের বামনাকার তিনটে পুরুষকে। একজনের মুখে হাসি যেন আর ধরে না। পোশাক দিব্বি পরিষ্কার, স্মার্ট। গোনজালিস এরই নাম সন্দেহ নেই। অপর তুজনের চাষাড়ে চেহারা। যেন বোবা, মুখে রা'টি নেই।

মেয়েতুটি শ্যামাঙ্গী। কিউবার নীচু মহলের বেশ্যা বলেই মনে হল। পরনে অতি উজ্জ্বল স্নানবস্ত্র, বিস্তর সোনার গহনা। সুদৃশ্য বানরের মত হাসি আর কিচ কিচ কথা নিয়েই মত্ত তুজনে। এতদূর থেকেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে রসালাপ। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। কেননা ভাষাটা স্পেনীয়।

বণ্ড টের পেল, ঠিক এক গজ পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে রূপসী বনবালা। টেলিস্কোপ বাড়িয়ে দিয়ে বলল বণ্ড—"স্মার্ট লোকটা হল মেজর গোনজালিস। অন্য লোকতুটো বন্দুকবাজ বডিগার্ড। মেয়ে তুটোকে চিনিনা। ভন হ্যামারস্টাইন এখনো আসেনি।"

চোখে টেলিস্কোপ লাগাল মেয়েটা। ফেরৎ দিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। মন্তব্যের ধার দিয়েও গেল না। বাবা মা-র হত্যাকারীদের চিনতে পারল কি জুডি হ্যাভলক?—মনে মনে ভাবল বণ্ড।

মেয়েতুটির একজন তাকিয়েছে বাড়ীর দরজার দিকে। স্বাগত-ধ্বনির উল্লাসকণ্ঠ ভেসে এলো কানে। খর্বকায়, চৌকোনা চেহারার, প্রায় উলংগ একটা লোক বেরিয়ে এল রোদ্দুরে। টেবিল পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সবুজ লনের কিনারায়। নিঃশব্দে আরম্ভ হল শরীর চর্চা। পুরো পাঁচ মিনিট চলল ব্যায়াম পর্ব।

চুলচেরা চোখে মানুষটাকে দেখছিল বণ্ড। লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। মুষ্টিযোদ্ধাদের মত কাঁধের আর পাছার গড়ন। পেটে অবশ্য চর্বি জমছে। কুচকুচে কালো ঘন লোমে বুক আর পিঠের ওপর ঢাকা। হাতে পায়েও কালো লোমের কম্বল। কিন্তু একগাছি চুলও নেই মুখে বা মাথায়। হলদেটে সাদা করোটি সূর্যের আলোয়

যেন জ্বলছে। মাথার পেছন দিকে একটা টোল। খুব সম্ভব পুরোনো চোট। মুখের হাড়ের গড়ন মামুলী, মানে, সব জার্মান অফিসারের যে রকম হয়—চারচৌকো, কঠোর, উদ্ধত। ন্যাংটা ভুরুর তলায় চোখদুটো শূওরের চোখের মত কুৎকুতে। মুখবিবর বেশ বড়ই, ঠোঁট-দুটো কদাকার রকমের পুরু, লালচে। কোমরে ল্যাঙটের মত নামমাত্র কালো বস্ত্র। মনিবন্ধে জড়োয়া ব্রেসলেটে সোনার মস্ত রিষ্টওয়াচ। জুডির হাতে টেলিস্কোপ তুলে দিল বণ্ড। স্বস্তিবোধে ভরে উঠেছে মন। যাক, একটা ভাবনা কাটল। 'এম'-এর ফাইলে ভন হ্যামারস্টাইনকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল, লোকটাকে দেখতে অবিকল সেই রকমই বটে।

রূপসী বনবালার মুখ নিরীক্ষণ করল বণ্ড। নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর ভাব সেখানে। যাকে নিধন করতে এতদূর আসা, দেখা পাওয়া গেছে তার। কিন্তু এ মেয়েকে নিয়ে তো ঝামেলা হবে। শেষ মুহূর্তে হয়ত তীরধনুক বার করে গোলমালও বাঁধাতে পারে। মনস্থির করে ফেলল। বেশী কিছু নয়, করোটির নীচে ঘাড়ের ওপর ছোট ঘা মারলেই জ্ঞান হারাবে জুডি। তারপর কাম ফতে না হওয়া পর্যন্ত মুখ আর হাত বেঁধে রাখলেই হল। চুপিসাড়ে রিভলবারের কুঁদোয় হাত রাখল বণ্ড।

ধড়ফড় করল না বনবালা। স্বাভাবিকভাবে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। হেঁট হল, মাটিতে টেলিসস্কোপ রেখে ধনুক তুলল, তূণ থেকে একটা তীর নিয়ে ছিলায় লাগাল। বণ্ডের দিকে ফিরে ধীর শান্ত গলায় বললে—"নষ্টামি বুদ্ধি ছাড়ুন। তফাতে থাকুন। মাথার পেছনে চোখ না থাকলেও আমার নজর সব দিকেই। লণ্ডনের এক তালঢ্যাঙা এসে রিভলবারের কুঁদো হাঁকড়াবে মাথার ওপর আর আমি মোমের পুতুলটি হয়ে থাকব, তা ভাববেন না। মেরে পোস্তা ওড়াতে না পারি, তীর আমার ফসকায় না। পঞ্চাশ গজ দূর থেকে তো নয়ই,

একশ' গজ দূরে থেকেও পাখীরা রেহাই পায়নি আমার ধনুকের সামনে। খামোকা আপনার পায়ে তীর মারতে চাই না, পথ ছাড়ুন। মরণ-বাড় বাড়বেন না।"

একটু আগে দোনামনা করার জন্যে প্রচণ্ড আপশোষ হল বণ্ডের। খেঁকিয়ে উঠে বলল—"অনেক ইডিয়ট মেয়েমর্দানী দেখেছি, এমনটি কখনো দেখিনি। ফাজলামি ছাড়ো, খেলনার হাতিয়ার নামাও। এ কাজ ব্যাটাছেলের—খামোকা নালা কেটে জল আনতে যেওনা। তীর-ধনুক দিয়ে চার-চারটে শয়তানের মহড়া নেওয়ার প্ল্যানটা কি শুনি?"

একগুঁয়ে দুই চোখে যেন দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। তীর ছোঁড়ার পূর্ব মুহূর্তে যেভাবে ডান পা পেছনে দিয়ে তীরন্দাজ তৈরী হয়, ঠিক সেইভাবে প্রস্তুত হল রূপসী বনবালা। ক্রোধে কঠিন ঠোঁট নেড়ে বলল চিবিয়ে চিবিয়ে—"গোল্লায় যান আপনি। বেশী টেণ্ডাই মেণ্ডাই করবেন না—সরে দাঁড়ান। খুন হয়েছে আমার বাবা, আমার মা, আপনার নয়। এর আগেও এখানে একটা দিন, একটা রাত আমি কাটিয়েছি। ওরা কি করে আমি জানি। হ্যামারস্টাইনকে কোন সময়ে মাটিতে ফেলা যায়, তাও জানি। অন্যকে নিয়ে আমার মাথা ব্যাথা নেই।" এবার, বলার সঙ্গে সঙ্গে ছিলা টান-টান হল। তীরের মুখ ফিরেছে বণ্ডের পায়ের দিকে। "যা বলি তা করুন। নইলে পস্তাবেন। ভাববেন না মিথ্যে দাবড়ি দিচ্ছি। হ্যামারস্টাইনকে আমিই নিপাত করব, এই আমার পণ। ত্রিভুবনে কেউ নেই আমাকে রোখে।"

মহা ফাঁপরে পড়ল বণ্ড। মেয়েটা ফাঁকা আওয়াজ দেবার পাত্রী নয়। অবরুদ্ধ ক্রোধে উন্মাদিনীর মত ফুঁসছে, নাগিনীর মত দুলছে যে মেয়ে, তার অসাধ্য কিছু নেই। তাই বলল মোলায়েম গলায় বণ্ড "জুডি, সব চাইতে ভালো হয়, যদি দুজনেই হাত লাগাই। লণ্ডনে

তোমাদের একজন ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড আছেন। তাঁর হুকুমেই এসেছি ওদের খতম করতে। তাছাড়া একাজে আমি বেজায় পোক্ত। আমার যে হাতিয়ার, তার পাল্লাও তোমার হাতিয়ারের পাঁচগুণ বেশী। উঠোনে ঐ বসা অবস্থায় আমি খুন করতে পারি সব কটাকে। কিন্তু আরো সুবিধে হবে ওরা যখন নাইতে আসবে লেকে। আমি গুলি চালাবো ঠিক তখন। তীর ছুঁড়ে আমাকে বরং সাহায্য কোরো, কেমন ?” শেষের কথাটা প্রায় মিনমিন করেই বলল বণ্ড।

“না।” বনবালা পর্বতের মতই অটল। “ইচ্ছে হলে আপনি বরং আমাকে সাহায্য করলেও করতে পারেন—না করলেও কিছু এসে যায় না। ঠিকই ধরেছেন। ওরা দল বেঁধে জলে নামবে—বন্দুকবাজ গার্ড দুটো ছাড়া। কালকেও দেখেছি এগারোটা নাগাদ জলকেলী করেছে কুত্তার দল। আজও রোদের তাত বাড়ছে। জলে ওরা নামবেই। টমিগানের মত বন্দুক নিয়ে ঐ বেঁটে বক্কেশ্বর দুটো পাড়ে বসে পাহারা দেবে। কাল রাতে আমি নীচে গিয়ে একটা জায়গা বেছে এসেছি। তীর ছোঁড়ার উপযুক্ত জায়গা। চললাম সেখানে। যদি এখনো সুবুদ্ধির উদয় না ঘটে, কাটমোল্লার যা হাল হয় আপনারও তাই হবে,” বলে ছিলায় আরো খানিকটা টান মারল রূপসী।

রেগে তিনটে হয়ে বণ্ড বলল—“বেশ, তাই হোক। একবার বেরোই জঙ্গল থেকে, তারপর এমন টাইট দেবো যে ঠেলা বুঝবে। যাও চালাও তীর। আমিও নজর রাখছি। কাজ বাগিয়ে যদি ফিরতে পারো তাহলে ভালোই। না পারলে আমাকেই নামতে হবে। ধড়মুণ্ডু যা পাই, তুলে নিয়ে আসব ‘খন।”

ছিলেতে ঢিলে দিল রূপসী। বলল—“এই তো সুবুদ্ধি জেগেছে। এ তীর একবার চামড়ায় ঢুকলে টেনে বার করাও মুস্কিল। আমাকে নিয়ে আদিখ্যেতা না করে খেয়াল রাখবেন টেলিস্কোপের লেন্সে যেন রোদ না লাগে। নীচ থেকে লেন্সের ঝিকিমিকি দেখে ফেললেই

মুস্কিল।" যেন শেষ কথা বলা হল, এমনিভাবে অদ্ভুত হাসল সুন্দরী। পর মুহূর্তে উধাও হল জঙ্গলের মধ্যে।

ধীরে ধীরে চোখের আড়াল হল গাঢ় সবুজ তন্বী। জাহন্নমে যাক জুডি! নিমেষে মনটা তেঁতো হয়ে যায় বণ্ডের। এ পরিস্থিতিতে আগেভাগে গুলি চালানোও সম্ভব নয়—মেয়েটা তাহলে মরবে। জবুথবু হয়ে বসে থাকা ছাড়া পথ নেই। আগে ঐ মেয়েমর্দানী তীর ছুঁড়বে, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

বাড়ীর সামনে নড়াচড়ার আভাস দেখেই চোখে টেলিস্কোপ লাগাল বণ্ড। ব্রেকফাস্টের এঁটো বাসনপত্র সরাচ্ছে ঝি ছুটো। রূপাজীবা ছুটোর পাত্তা নেই। বন্দুকবাজ যুগলও নিপাত্তা। কোচে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছে ভন হ্যামারস্টাইন। মাঝেমাঝে কথা বলছে মেজর গোনজালিসের সঙ্গে। কোচের পায়ের কাছে বাগান-চেয়ারে বসে চুরুট টানছে মেজর। মধ্যে মধ্যে কাৎ হয়ে তামাক পাতা ফেলছে থু থু করে। পালের গোদার কথা পরিষ্কার না শুনলেও ভাষাটা ইংরেজী বুঝেছিল বণ্ড। মেজরও জবাব দিচ্ছে ইংরেজীতে। ঘড়ি দেখল বণ্ড। সাড়ে দশটা। ঠুঁটো জগন্নাথের মত কাঁহাতক বসে থাকা যায়! গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে 'স্যাভেজ' রাইফেলের প্রতিটি অংশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করে নিল বণ্ড।

হাতে আর কোনো কাজ নেই। শুরু হল আকাশ পাতাল চিন্তা। ভন হ্যামারস্টাইন নিঃসন্দেহে সমাজের শত্রু। এরকম বদমাসের চটপট অক্কা পাওয়াই উচিত। জুডি এসেছে বাপ-মা হত্যার শোধ তুলতে। কিন্তু বণ্ড? বণ্ড কেন এসেছে? তার সঙ্গে হ্যামারস্টাইনের কোনো বিবাদ তো নেই। তবুও এসেছে। কারণ, সমাজের শত্রুকে ধরণীর বুক থেকে সরিয়ে দেওয়াই তার কাজ, তার পেশা, তার ব্রত। ইঁদুর মারতে যেমন ডাক পড়ে পেস্ট কনট্রোল অফিসারের, তেমনি বণ্ডের ডাক পড়েছে ভন হ্যামারস্টাইনকে ছুনিয়া থেকে সরানোর জন্যে।

সহসা লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল বণ্ড। উপত্যকায় এক ঝলক আগুন দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্রের নির্ঘোষ শোনা গেছে। দ্বিতীয় নির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল তাগ করল বণ্ড। হতাশ হল পরক্ষণেই।

দেখা গেল, নীল-ধূসর পালক ছড়িয়ে একটা মাছরাঙা পাখী ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ল ভন হ্যামারস্টাইনের পায়ের কাছে। গুলিবিদ্ধ পাখী। কেননা, ধোঁয়া উঠতে দেখা গেল হ্যামারস্টাইনের হাতে ধরা টমিগানের নলচে থেকে। হাসছে আর হাততালি দিচ্ছে সাঙ্গপাঙ্গরা। পালের গোদা নিজেও লাল ঠোঁট বেঁকিয়ে যুদ্ধজয়ের হাসি হাসছে। পরমুহূর্তেই হুকুম করল মেয়ে দুটিকে। দৌড়ে বাড়ীর ভেতরে গেল দুজনে। ফিরে এল দুটি স্যাম্পেনের বোতল নিয়ে।

বন্দুকবাজ দুই স্যাঙাৎ টমিগানে গুলিভরা নতুন ম্যাগাজিন লাগাল। দুজনেই হেলান দিয়ে দাঁড়াল বাঁধের গায়ে। একই সঙ্গে স্যাম্পেনের বোতল দুটো শূন্যে নিক্ষেপ করল ভন হ্যামারস্টাইন। একই সঙ্গে ঘুরে গিয়ে একই সঙ্গে টমিগান তুলে একসাথে ট্রিগার টিপল দুজনে। গুলিবর্ষণের বজ্রনির্ঘোষে থরথর করে কেঁপে উঠল উপত্যকা। পাখীর দল ককিয়ে উঠে উড়ল আকাশে। গুলীর ঘায়ে ছিন্নভিন্ন ডালপাতা ছিটকে গেল লেকের জলে। একটা বোতল নিমিষে গুঁড়িয়ে পাউডার হয়ে গেল। আর একটা সেকেণ্ডখানেক পরেই দুটুকরো হয়ে গেল একটি মাত্র বুলেটের ঘায়ে। বিজয়ী বন্দুকবাজের বুক ফুলে উঠল গর্বে। মাথা হেঁট হল অন্যজনের।

ভন হ্যামারস্টাইন লেকের দিকে এগোচ্ছে। এবার শুরু হবে স্নান-পর্ব। মেয়েদুটি আগেই জলে ঝাঁপ দিয়েছে। সাঁতরাচ্ছে। ঘাসের ওপর কোট বিছিয়ে বসে পড়েছে গোনজালিস। বন্দুকবাজ দুই বডিগার্ড টমিগান কোলে নিয়ে পর্যায়ক্রমে তাকাচ্ছে পালের গোদা, বাড়ী আর গাছপালা জঙ্গলের দিকে। প্রহরায় ত্রুটি নেই। ভন

হ্যামারস্টাইন এত অপকর্ম করেও যে এতদিন কেন বেঁচে আছে, বণ্ড এবার বুঝল।

কিন্তু গেল কোথায় মেয়েটা ? কোথায় সেই রূপসী বনবালা ? ভেতরে ভেতরে অপরিসীম উদ্বেগে ছটফটিয়ে ওঠে বণ্ড। সময় যে বয়ে যায়। সুযোগ যে মুঠোয় এসেও ফসকায় ! রাইফেল বাগিয়ে গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় বণ্ড। টেলিস্কোপ সাইটের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভন হ্যামারস্টাইনকে। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ডাইভিং বোর্ডে। জলে ঝাঁপ দেওয়ার পূর্ব মুহূর্ত এসেছে। হাঁটু ঈষৎ বেঁকেছে, দুই হাত তুলে এসেছে পেছনে, তারপরেই হাত এগোলো সামনে—লাফিয়েছে ভন হ্যামারস্টাইন—দুই পা লাফ দেবার তক্তা ছেড়ে তখনও শূন্যে—ঠিক এই সময়ে একটা রূপোলী ঝলক দেখা গেল ভন হ্যামারস্টাইনের পিঠে। পরমুহূর্তেই দেহটা গোঁৎ খেয়ে গিয়ে পড়ল লেকের জলে। ঠিক যেন পাকা সাঁতারু ডাইভ মেরে ডুব দিল জলে।

গোনজালিস উঠে দাঁড়িয়েছে। সত্যিই কিছু চোখে পড়েছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছে না। চোখে তাই বিমূঢ় চাহনি। কিন্তু বন্দুকবাজ দুই ঠ্যাঙাড়ের চোখে দ্বিধা নেই। ওরা দেখেছে এই মাত্র কি ঘটে গেল। ওরা তাই গোনজালিসের দিকে না তাকিয়ে চোখ চালিয়েছে পেছনে গাছের সারির দিকে। টমিগান উদ্যত—হুকুম পেলেই হয়।

অবিশ্বাসী চোখে তখনো লেকের জলে তাকিয়ে আছে গোনজালিস। জার্মান গুরুর দেহ লেকের জল তোলপাড় করে ডুবে গেছে। আস্তে আস্তে জল শান্ত হয়ে এল। কিন্তু গুরুদেবের পাত্তা নেই। খুব জোরে ডুব দিয়েছে তো ! কিছুক্ষণ পরেই ভাসল দেহটা। তবে উপুড় হয়ে। জলে মুখ গুঁজে ভাসছে ভন হ্যামারাইন। নিস্পন্দ। ঢেউয়ের ধাক্কায় ঈষৎ দুলুনি। পিঠের বাঁদিকে চ্যাটালো হাড়টার ঠিক নীচেই বিঁধে রয়েছে একটা চকচকে বস্তু। ইস্পাতের ফুটখানেক

লম্বা একটা সরু শিক। অ্যালুমিনিয়াম পালক ঝলসাচ্ছে সূর্যের আলোয়। ধীরে ধীরে লাল হচ্ছে জল।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে কি যেন বলল মেজর গোনজালিস। ধমক দিয়ে উঠল দু'দুটো টমিগান। আগুনের যেন স্রোত বয়ে গেল নলচে দিয়ে। গুলির পর গুলি আছড়ে পড়ছে নীচের ঝোপে, গাছপালা ছিঁড়েখুঁড়ে লণ্ডভণ্ড করছে নির্মম বুলেট রাশি। বণ্ডের 'স্যাভেজ' গর্জে উঠল। ডানদিকের বন্দুকবাজ আস্তে আস্তে মুখ থুবড়ে পড়ল ঘাসের ওপর। বাঁদিকের বন্দুকবাজ দৌড়োচ্ছে লেকের দিকে—ছুটন্ত অবস্থাতেই পাছার পাশ দিয়ে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। ফায়ার করল বণ্ড। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল। আবার টিপল ট্রিগার। ছুটন্ত লোকটার হাঁটু দুমড়ে গেল। কিন্তু ছোটার বেগেই ছিটকে গিয়ে পড়ল লেকের জলে। জলে পড়েও আকাশমুখো টমিগানের নলচে দিয়ে গুলি উড়ে গেল নীল শূন্য লক্ষ্য করে। লোকটা মারা গেছে। কিন্তু আঙুল টাইট হয়ে বসে রয়েছে বন্দুকের ট্রিগারে—তাই এই গুলিবর্ষণ। দেখতে দেখতে জল ঢুকে বন্ধ হয়ে গেল ভলকে ভলকে আগুন বেরোনো।

লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে বণ্ড যে কটি সেকেণ্ড সময় দিয়েছিল মেজর গোনজালিসকে, তার মধ্যেই মেজর গিয়ে লুকিয়েছে প্রথম বন্দুকবাজের লাসের আড়ালে। সেইখান থেকেই টমিগান মুখর হল মেপ্‌ল্ গাছ লক্ষ্য করে। বণ্ডকে মেজর দেখতে না পেলেও হয়ত 'স্যাভেজে'র আগুন-ঝলক দেখেই আঁচ করে নিয়েছে শত্রুর হদিস। রূপোলী পাতা ঝরে ঝরে পড়তে লাগল বণ্ডের মাথায়। বুলেট এসে গুঁড়িতেও বিঁধল।

পর পর দুবার গুলি করল বণ্ড। দুটি গুলিই বিঁধল মড়ার গায়ে—দুলে উঠল নিষ্প্রাণ বন্দুকবাজ। নতুন করে গুলি ভরে তাগ করল বণ্ড। একটা ছোট ডাল ভেঙে পড়ল নলচের ওপর। ডাল সরাতে সরাতেই দেখল লাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে

বাগানের চেয়ার টেবিলের দিকে দৌড়োচ্ছে মেজর গোনজালিস। বণ্ডের বুলেট মেজরের গোড়ালির কাছ থেকে দু খাবলা ঘাসমাটি উড়িয়ে নিয়ে গেল পলক ফেলতে না ফেলতেই। ইতিমধ্যে লোহার মস্ত টেবিলটাকে ঢালের মত ফিরিয়ে ধরেছে মেজর। আড়ালে বসে টমিগান চালাচ্ছে সমানে। কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে, কখনো ওপরে। সুবিধে অনেক। বণ্ডের গুলি লোহায় লেগে ঠিকরে যাচ্ছে। বার বার টেলিস্কোপিক সাইট লক্ষ্যে স্থির করতে সময়ও লাগছে বণ্ডের। মেজর অথচ বার বার অবস্থান পালটাচ্ছে।

বণ্ড দেখল মহা বেগতিক। এভাবে কাঁহাতক গুলি খরচ করা যায়! যা হয় হোক। খোলা মাঠে গিয়ে সামনাসামনি টক্কর নেওয়া যাক। সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে ঢালু মাঠের মধ্যে দৌড়োলো বণ্ড। মেজরও খলিফা। দেখল এভাবে সময় নষ্ট না করে লেক পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকলে ঘুরে এসে বণ্ডকে একহাত নিতে সুবিধে। সে-ও টেবিলের আড়াল থেকে বেরিয়ে দৌড়োলো লেকের দিকে। এমন সময়ে খোলা মাঠে বণ্ডকে বেরিয়ে আসতে দেখে লোভ সামলাতে পারল না। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ঘাসজমির ওপর। বর্ষণ করল এক ঝাঁক গুলি। পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল বণ্ড। কান দিয়ে শুনল উড়ন্ত বুলেটের সাঁই সাঁই শব্দ। নিষ্কম্প হাতে লক্ষ্য স্থির করল টেলিস্কোপিক সাইটের মধ্যে দিয়ে। ক্রস চিহ্নটা যেই স্পষ্ট হল মেজরের হৃৎপিণ্ডের ওপর, সঙ্গে সঙ্গে টিপল ট্রিগার। উঠে দাঁড়াতে গেল গোনজালিস। পারল না। দুহাত শূন্যে তুলে হুড়মুড় করে তলিয়ে গেল হ্রদের জলে—জলে পড়ার সময়ে হাতে ধরা টমিগানের এলোমেলো অগ্নিবর্ষণ রইল অব্যাহত।

সবুর করল বণ্ড। না। মেজরের ভেসে ওঠার লক্ষণ দেখা গেল না। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে মেপ্‌ল্ গাছের দিকে এগোলো ধীর পায়ে।

দেখল, গুঁড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে জুডি হ্যাভলক। গুঁড়িতে বাহু রেখে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে রূপসী। ডানবাহু দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। তীর ধনুক পড়ে পায়ের কাছে। থর থর করে কাঁপছে দুই কাঁধ।

কাঁধে হাত রাখল বণ্ড। নরম গলায় বলল—"জুডি, আর ভয় নেই। খেল খতম। কোথায় লাগল?"

অবরুদ্ধ কণ্ঠ জুডির—"তেমন কিছু নয়। হঠাৎ কি যেন বিঁধে গেল। উঃ, এমন যে হবে ভাবতেও পারি নি।"

"ওরা পেশাদার খুনে—তাই বলেছিলাম একাজ পুরুষের, মেয়েদের নয়। যাকগে, দেখি হাতটা। চটপট চম্পট দিতে হবে। নষ্ট মেয়ে-গুলো এতক্ষণে বোধ হয় বর্ডার ফোর্সকে খবর দিতে দৌড়োচ্ছে।"

ঘুরে দাঁড়াল জুডি। সুন্দর মুখটা ঘামে আর চোখের জলে একাকার। কিন্তু ধূসর চোখে এখন কোমলতা। একগুঁয়েমির লেশমাত্র নেই।

জুডির কোমরের বেল্ট থেকে শিকারী ছুরি টেনে নিয়ে ওর কাঁধের সার্ট কেটে ফেলে দিল বণ্ড। বুলেট বিঁধে নেই, মাংসপেশী চিরে হাঁ করে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। নিজের খাকী রুমাল নিয়ে তিনফালি করল বণ্ড। গিঁট দিয়ে লম্বা করল। ফ্লাস্ক থেকে কফি আর হুইস্কি ঢেলে ক্ষতস্থান ধুয়ে দিল। হ্যাভারস্যাক থেকে বেরুলো পাঁউরুটি। ক্ষতস্থানে পাঁউরুটি চাপা দিয়ে বেশ করে বাঁধল ছেঁড়া রুমাল। তারপর ব্যাণ্ডেজবাঁধা হাতটা ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে দিল জুডির গলায়। গোলাপী দুটি ঠোঁটের অত্যন্ত কাছে বণ্ডের ঠোঁট। মাত্র কয়েক ইঞ্চি ব্যবধান। রূপসীর গায়ের গন্ধে উতলা হল মন। কেমন জানি বুনো গন্ধ। আলতো করে ঠোঁট ছোয়ালো ঠোঁটে। তারপর জোরে। জুডির চোখে বিস্ময় আর তৃপ্তি। এবার ঠোঁটের দুপ্রান্তে দুটি চুমু দিতেই হেসে ফেলল সুন্দরী। সরে দাঁড়িয়ে বণ্ডও হাসল।

"কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?" শুধোয় জুডি—অনুরক্ত কণ্ঠে।

"লণ্ডনে", বলল বণ্ড। "এক বৃদ্ধ সেখানে তোমায় দেখবার জন্যে উতলা। তার আগে যাবো কানাডায়। তোমার পাসপোর্টের একটা গতি করতে হবে। তোমার কিছু জামাকাপড় জিনিসপত্রও তো চাই। দিন কয়েক লাগবে। থাকবো কো-জী মোটেলে।"

জুডি শুধু তাকালো। এ চাহনি আগের চাহনির মত নয়। মেয়েটাও যেন হঠাৎ পালটে গিয়েছে। বলল নরম গলায়—"মোটেলে এর আগে কখনো থাকিনি। বেশ হবে।"

হেঁট হয়ে রাইফেল আর হ্যাভারস্যাক তুলে নিয়ে এক কাঁধে ঝোলালো বণ্ড। আর এক কাঁধে ঝুলল জুডির ধনুক আর তূণ। এগোলো মেঠো পথে।

পেছন পেছন এল জুডি হ্যাভলক। হাঁটতে হাঁটতেই খুলে দিল মাথার ফিতে। এক রাশ হাল্কা সোনালী চুল এলিয়ে পড়ল দু' কাঁধে।

—এই সিরিজের আগের বই—

ইয়ান ফ্লেমিং রচিত

তিনটি "জেমস বণ্ড" রহস্যোপন্যাসের

অনবদ্য বাংলা রূপান্তর

থাণ্ডারবল (৬·৫০)

ডক্টর নো (৮·০০)

সম্রাজ্ঞীর গুপ্তচর (৮·০০)

* * *

—আমাদের পরবর্তী দুটি অনুবাদগ্রন্থ—

জেমস হেডলী চেস্-এর

দুর্দান্ত রহস্যকাহিনী

একদা শারদ প্রভাতে

(One Bright Summer Morning)

এবং

ইয়ান ফ্লেমিং-এর

গোল্ড ফিংগার

(Gold Finger)